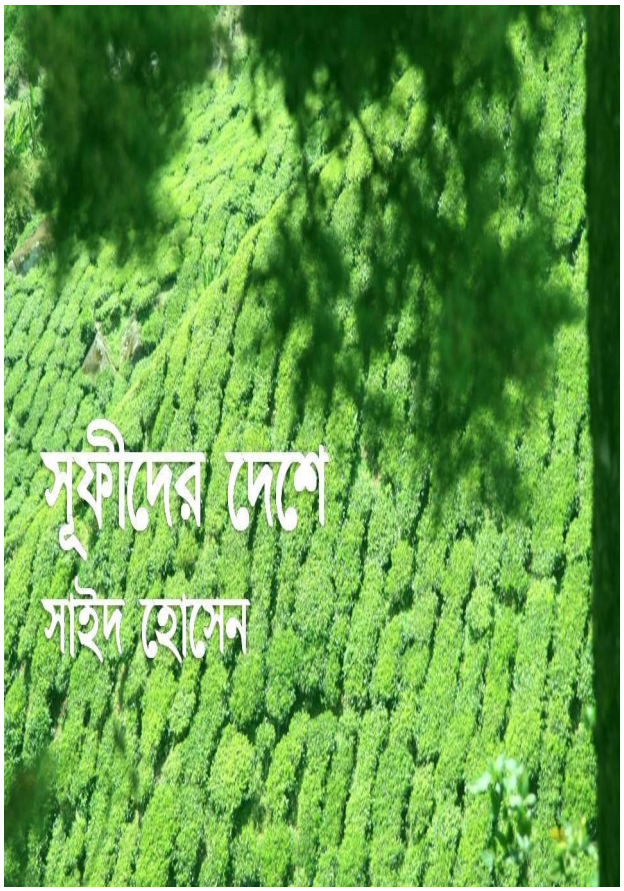
সুফীদের দেশে
সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০৮

Date of first edition publication: May, 2008

© সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

© Published by Sayed Hossain

Contact Address:
যোগাযোগ:

Sayed Hossain
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya,
Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at URL: www.sayedhossain.com

©Sayed Hossain 2008

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

ISBN No. 978-983-43934-3-4

** The ISBN number is provided by the National Library of Malaysia.

© Sufider Deshe, A Bengali novel written by Sayed Hossain.

প্রথম অধ্যায়

সকালের বৃষ্টি

ঘুম ভেঙে গেল বৃষ্টির শব্দে । মালয়শিয়ার আকাশে তখনো বৃষ্টি ঝরছে সেই ভোর রাত থেকে । জানালাটা একটু চাপিয়ে আবার কাথা মুড়ে শুয়ে পড়েছি । আজ সারাদিন ছুটি তাই বই পড়ে, বেগুন ভাজা খেয়ে কাটাবো ।

শেল্প থেকে বে-ঢড়ক সাইজের একটা বই নামিয়েছি । রবার্ট মিশকিনের লেখা । বড্ড কঠিন ভাষায় লিখেছেন তিনি । আলতো করে আবার সেলফে রেখে বুদ্ধদেব নিয়ে বসেছি মাত্র টেলিফোন এলো ।

ওই পাড় থেকে আমাদের ডিনের পিএস রিনার মিষ্টি গলা ।
- সাইদ, তোমাকে একবার ফ্যাকাল্টি আসতে হচ্ছে কারণ পরীক্ষা শুরু হয়েছে অথচ ইনভিজিলেটর এসে পৌঁছায়নি । তুমি আসতে পারবে ?
- ঠিক আছে আসছি, বলে ফোন রেখে দিলাম ।

বাঙলো থেকে নামলেই আমার ফ্যাকাল্টি । ছিমছাম চার তলা হলদে দালান আর সেই দালানের ধার ঘেঁষে থই থই করছে হাজারো নাম অজানা গাছ । ফ্যাকাল্টির তিন তলায় আমার বসার ঘর । সেই ঘর লাগোয়া ছোট্ট একটা বাগানের ঘর । ছেলেবেলা থেকে অর্কিড আর ঝাউয়ের প্রতি দুর্দান্ত আকর্ষণ বোধ করতাম, তাই পুরোটা ঘর জুড়ে লাগিয়েছি অর্কিড আর ঝাউয়ের গাছ । অর্কিড আর ঝাউয়ের সুবিধে হলো এদের চাহিদা নিতান্তই কম । অল্প যত্নেই ফুলে ফেপে বড় হয়ে উঠতে পারে ওরা ।

আজ বছর দুই হলো ঝাউ গাছটা লাগিয়েছি । তখন ও খুব ছোটটি ছিল । দুই বছরের মধ্যে ফুলে ফেপে আমার কাধ ছুঁইছুঁই করছে এখন । আমি পাশে দাঁড়ালে সে হেলে পড়ে । মনে হয় কত আপনার । ঝাউয়ের সাথে যে অর্কিড রয়েছে, ওকে বেড়ে উঠবার অবলম্বন দিয়েছি । সেইটে বেয়ে তর তর করে উঠে যাচ্ছে অর্কিডটা ।

অর্কিড আর ঝাউ, ওরা এক সময় থেকে আমার সাথে আছে । প্রায়ই ভাবি যখন দেশে ফিরে যাব, এদের কি হবে ? জাহাজের সাথে কথা বলে রেখেছি । ওদেরকে জাহাজে তুলে দেব তারপর চিটাগং বন্দর থেকে ছাড়িয়ে নিলেই হবে । কোথায় যেন একটা মায়া পড়ে গেছে বধির, নিষ্পাপ গাছ দুটোর জন্য ।

বেগুন ভাজা আর খাওয়া হলো না । ইস্ত্রি করা সার্টটা চাপিয়ে, ফ্যামিলি সাইজ ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম । দশ মিনিটের হাঁটা পথ কিন্তু এ'টুকুন যেতেই অনেকখানি ভিজে উঠলাম । এ দেশের বৃষ্টি এতো গভীর আর ভারী যে, বৃষ্টি নামলেই মনে হবে এই বুঝি সব ভাসিয়ে নিল । বৃষ্টির ফোঁটা এতো বড় আর এতো সাদা, চোখে না দেখলে বিশ্বেস করা যায় না ।

এই যে আকাশ ঝরা বৃষ্টি আর চোখ ঝলসানো সূর্যের উত্তাপ, এ সব কিছুই মালয়শিয়ার বিস্তীর্ণ বনভূমি গড়তে সাহায্য করেছে । কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আজ অবধি কেউ এই বনভূমি পরখ করে দেখেনি বা দেখবার প্রয়োজন হয়নি । মেলাকা স্ট্রেইটের পাড়ে বিশাল ভূ-খন্ড জুড়ে আছে মালয়শিয়া । ঠিক ঠিক হিসেব করলে বাংলাদেশ থেকে মালয়শিয়ার আয়তন প্রায় আড়াই গুণেরো বেশি অথচ লোকসংখ্যা সবে মাত্র দুই কোটি ছাড়িয়েছে । এই দু'কোটির জন্য কতটুকুই বা জনপদ দরকার ? তাই এই বিস্তীর্ণ বনভুমি আজও অনাবিস্কৃত রয়ে গেল ।

আজ বছর দুয়েক হলো মালয়শিয়া এসেছি মাস্টারির চাকরি নিয়ে । ছাত্র-ছাত্রী পড়াই আর সময় হলে পাহাড়ে উঠি । পুরো দেশটাই পাহাড়ে ঘেরা । সেই পাহাড়ের খাঁজে মানুষেরা হরেক রকমের ঘর-কোঠা বানিয়েছে । বেশির ভাগ ঘর-কোঠা সিমেন্ট-কাঠ দিয়ে চোঙা করে বানানো । দূর থেকে মনে হবে আমরা হয়ত নিঝুম দ্বীপে এসেছি ।

এদেশের যে দিকেই তাকাই না কেনো, হাজারো গাছ-গাছালি আর বন বাদারিতে ভরা । কোন শীতকাল নেই, সারা বছড় জুড়ে চোখ ধাঁধাঁনো আলো আর আকাশ ঝরা বৃষ্টি । এ এক বিচিত্র দেশ, বিচিত্র এর মানুষ, সে কথা পরে আবারো বলছি ।

ফ্যাকাল্টি পৌঁছে দেখলাম যে লোকটার আসতে দেরি হয়েছিল তিনি এসে পৌঁছেছেন ।

ডিনের পিএস রিনা খুব বিনয়ের সাথে বলল, তুমি কিছু মনে করো না সাইদ । তোমাকে না ডেকে উপায় ছিল না ।

আমি হেসে বললাম, আমার কোন অসুবিধা হয়নি । ফ্যাকাল্টির সাথেই তো আমার বাসা । তুমি অযথা ব্যস্ত হচ্ছ, এই বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম ।

এই দেশের মানুষেরা স্বভাবগত ভাবে শান্তি প্রিয় । অযথা কলহে জড়িয়ে পড়তে এদের সচারচর চোখে পড়ে না অথবা বলা যেতে পারে এই পুরো আসিয়ানরাই শান্তিতে থাকতে পছন্দ করে । না এদের আছে সীমান্তে যুদ্ধ, না কোন রেষারেষি । আসিয়ান পরিবারের দশটি দেশ একে অপরের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে । এই আসিয়ানদের কথা পরে আবারও বলবো ।

বাইরে তখনও মূষলধারে বৃষ্টি ঝরছে । কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না । বাঙলো তে ফিরে যাবো না ক্যাফেটেরিয়াতে লাঞ্চ করব ? শেষমেষ বেগুন ভাজারি জয় হলো । বাসায় যে বেগুন ভেজে রেখে এসেছি, সেইটে খাবো ঠিক করলাম ।

ছাতাটা খুলেতে নিয়ে খোলা হলো না । ভাবলাম কতদিন বৃষ্টিতে ভিজি না ? যেমনি মনে হওয়া তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়া । হাঁটা দিলাম এক রাশ ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে । প্রথম ধাক্কায় মাথার সব চুলে ভিজে এলো তারপর সেই পানি গলা-চিবুক বেয়ে সার্টের ভেতর ঢুকতে শুরু করল । তখন কেবলি মনে হতে লাগল, এই বুঝি তলিয়ে যাচ্ছি ।

বাঙলোতে পৌঁছে সাওয়ার সেরে নিলাম তারপর বেগুন ভাজা নিয়ে বসেছি । বেলা তখন তিনতে ছাড়িয়েছে অনেকক্ষণ । ক্ষুধা-তেষ্টা দুই পেয়েছে । আজ আর কাল ছুটি তাই লম্বা ঘুম দেবো আর সেইটে করতে নিজেকে এলিয়ে দিলাম সারা বিছানা জুড়ে । ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছি । ঘুমের ফাঁকে আলতো করে তাকিয়ে দেখলাম, বাইরে চলছে ঝড় আর বৃষ্টির মাতামাতি । কেউ কাউকে ছাড়বে না আজ, পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে ওদের দাপাদাপি । কেমন যেন শীত শীত করতে লাগল । বিছানার ধার থেকে কম্বলটা চাপিয়ে নিলাম । কম্বলের উষ্ণতা আর ঝড়-জলের দাপাদাপি, এসব দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, সে খেয়াল নেই ।

পুরোনো ঢাকার এক প্রান্তে আমার জন্ম । শৈশব-কৈশর কেটেছে পুরোনো ঢাকার অলি গলি মাড়িয়ে তারপর একদিন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম । শুরু হলো লম্বা পড়া । সে পড়া শেষ করতে অনেকটা বছর তারপর মাস্টারির চাকির নিয়ে এসেছি এদশে । কিন্তু এই যে এতটা বছর পার করে দিলাম, এই যে বাবা-মাও হারিয়ে গেলেন কালের স্রোতে । কিন্তু যখন বাঙলোর কার্নিস কাঁপিয়ে উত্তাল হাওয়া বয়ে চলে । যখন হাজারো বৃষ্টির কণা আছড়ে পড়ে আমার ছাদে । তখন মনে পড়ে যায় সেই ছেলেবেলার কথা, সেই মিঠে পানিতে সাতারের কথা, হাজারো নক্ষত্রে ভরপুর ছায়াপথের কথা ।

মাঝে মাঝে অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় । ধড়ফড়িয়ে উঠে বসি । বাইরে তাকিয়ে দেখি হাজারো নক্ষত্রের আলো এসে পড়ছে আমার মেঝেতে । দূরে, অনেক দূরে বাবা মার ডাক ভেসে আসে । বাবু, এই দিকে, আমরা এই দিকে । অনেক খুঁজেও তাদের পাই না । তাকিয়ে দেখি ডান দিকে শুকতারাটা দপদপ করে জ্বেলে চলেছে । তখন খুব তেষ্টা পায় । এক গ্লাস পানি খেয়ে আবার শুয়ে পড়ি ।

দ্বীতিয় অধ্যায়

নায়লা

তুমি বাংলাদেশ থেকে এসেছ ? কে যেন পাশ থেকে অসম্ভব সুন্দর সুরে জানতে চাইল ।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম এক দীর্ঘাঙ্গীনি আমার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে যার সারা অবয়ব বেয়ে অঝোরে ঝরে পড়ছে হাজারো নক্ষত্রের আলো । মানুষের চোখের রং যে এত গভীর আর নীলাভ হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হতো না ।

তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটি তার গভীর আর নীলাভ নয়ন দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে । আমি প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম তারপর মাথা নেড়ে বললাম, হু । আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি ।
মেয়েটি বললো,

আমি নায়লা । ইরান দেশের মানুষ আমি । এই স্কুলে শিক্ষকতা করছি বছর দুই হলো । ছেলেপুলেদের আর্ট শিখাই । তুমি এখানে কি মনে করে ?

- আমি এসেছি বন্ধুর ছেলের জন্য ফরম নিতে ।
- তুমি কি কর জানতে পারি ?

আমি হেসে বললাম, তোমারি মতন মাষ্টারি করি । ছাত্র-ছাত্রী পড়াই এখানকার এক কলেজে ।
নায়লা বললো, ভালই হলো তোমার সাথে পরিচিতি হয়ে । অনেক কথা জানা যাবে তোমার দেশ সম্পর্কে ।

- কি জানতে চাও ?
- তুমি সময় দিতে পারবে আমার বাবা-মার সাথে একবার দেখা করবার ? ওরা খুব খুশি হতো ।

হঠাৎ করে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এক অনিন্দ্যসুন্দরীর এমন আন্তরিকতায় রীতিমত দ্বীধা-দ্বন্দে পড়ে গেলাম । কি জবাব দেবো তা নিয়ে ইতস্তত করছি ।

নায়লা বুঝলো সে কথা ।

- তোমার সময় হবে ? তাহলে আমরা না হয় ওধারে গিয়ে চা-কফি কিছু খেতাম ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

ক্যান্টিনে ঢুকে নায়লা বললো, আমি চা-কফি কিছু খাই না । তোমার জন্য বলেছি মাত্র । তুমি কিছু মনে করলে ?

-না, আমি মাথা নেড়ে বললাম ।

নায়লা বলতে শুরু করলো,

বছর পাঁচেক আগের কথা । আমরা তখন ইরানে ছিলাম । বাবা সরকারি চাকুরে । এক ভাই আর এক বোন নিয়ে আমাদের ছোট্ট পরিবার । আমি সবার বড় । ভাইটা তখন ইন্জিনিয়ারিং পড়ে ইরানে । সে সময় বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা ট্যুরের অফার এল । আমার ভাই আর তার সাত বন্ধু মিলে চলে গেল সেই ট্যুরে । ঝাড়া এক মাসের লম্বা সফর । প্রথম তিন সপ্তাহ ওদের ভাল কাটল তারপর ফিরবার দুদিন আগে ভাইটা আমার রোড এ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় । এ্যাক্সিডেন্টটা এমন হয়েছিল যে ওর দেহের অনেক অংশ পাওয়া যায়নি । খবর পেয়ে আমরা ছুটে গেলাম তোমাদের দেশে ।

আমার বাবা বললেন,

খুদা এদেশে ওর মৃত্যু রেখেছেন । এ ছাড়া ওর দেহের অনেক অংশ পাওয়া যাচ্ছে না । ওর কবর এই মাটিতেই হবে । মা আপত্তি করেননি সে কথায় । ঢাকার বনানিতে আমার ভাইয়ের কবর হলো ।

আমি বললাম, তোমার ভাইয়ের নাম কি ?

- ওর পুরো নাম হাসান ওমর কুরাইশি । কুরাইশি হোল আমার দাদাজীর নাম তাই আমাদের নামের শেষে কুরাইশি জুড়ে দেয়া আছে । যেমন, আমার পুরো নাম নায়লা ওমর কুরাইশি ।

আমি বললাম, তোমার কথায় দুঃখ পেলাম । আমি কি কিছু করতে পারি ?

- তোমাকে ধন্যবাদ । তুমি আর কি করতে পার ? আমরা প্রতি বছরি যাই হাসানের মাজারে । এই তো কিছুদিন আগে মা ঘুরে আসলেন । ফিরবার সময় মাজারের চারিদিকে ছোট ছোট গাছ লাগিয়ে এসেছেন ।

আমি বললাম, তোমার কতবার যাওয়া পড়েছে বাংলাদেশে ?

- পাঁচ-ছবার তো হবেই, বলা শেষ হতে না হতেই শুরু হলো বৃষ্টি ।

পুরো স্কুলটা পাহাড়ের খাঁজে বানানো । পুরো দেশটাই তো পাহাড়ে ঘেরা, সে কথা তো আগে বলেছি । আমরা যে ধারটাতে বসেছিলাম, তার ডান বেয়ে নেমে গেছে গভীর পাহারী খাদ আর সেই খাদটা ভরপুর হয়ে আছে হাজারো গাছ-গাছালি দিয়ে । বৃষ্টির তর্জন-গর্জন ক্রমেই বেড়ে চলেছে । তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে ঝোড়ো হাওয়া । ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে খাদের গভীরে থাকা গাছগুলো দাঁড়াতে পারছিলো না । খাদের নোনতা জলো হাওয়া সাদা কুয়াশার রুপ নিয়ে আমাদের উপরে উঠে এলো, ফলে ধীরে ধীরে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি পৃথিবীর সীমানা থেকে । তখন কেবলি মনে হতে লাগল, আমি বুঝি পৃথিবীর বাসিন্দা নই । পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে, হাজারো নক্ষত্রকে পাশ কাটিয়ে, নূতন পৃথিবীর নেমন্তন্ন খেতে চলেছি । সেই অদেখা, সেই অচেনা পৃথিবীর কথা পরে আবারও লিখছি ।

আমি বললাম, কেমন লাগল বাংলাদেশে ?

- যে মাটিতে হাসান শুয়ে আছে, সে মাটির রং, সে মাটির গন্ধ, সে দেশের মানুষ সব আমাদের প্রিয় । যতবারি তোমাদের দেশে গিয়েছি, মনে হয়েছে কত আপনার । কোথায় যেন মায়া পড়ে গেছে ঐ দেশটার জন্য ।

একটু থেমে নায়লা আবার বলতে শুরু করলো,

বাংলাদেশে আমরা অনেক ঘুরেছি । ঢাকা থেকে চিটাগাং গিয়েছি ট্রেনে । সদরঘাট থেকে বরিশাল রকেটে । পুরোনো ঢাকায় বেড়াতে গিয়েছি । সেখানে সদরঘাট দেখেছি । হাইকোর্টের মাজার থেকে বড়ো বড়ো গাছের চারা এনে হাসানের মাজারে বুনে দিয়েছি । একজন লোক অছেন, যিনি গাছগুলোর দেখাশুনে করেন । বুড়ো মতন মানুষ, নাম করিম সাহেব । আমাকে আপা বলে ডাকে । আপা মানে যে বড় বোন সেটা প্রথম জানলাম । আচ্ছা, লোকটা আমাকে আপা বলে কেন ? আমি তো উনার বড় নই ।

আমি হেসে বললাম, আমাদের দেশে সব মহিলাকেই আমরা আপা বলি ।

- ও তাই, বলে নায়লা চুপ হয়ে গেল ।

আমি জানতে চাইলাম, আবার কবে যাচ্ছ বাংলাদেশে ?

- আগামী জানুয়ারিতে । তখন তো হাসানের ইন্তেকাল বার্ষিকী । আমরা সবাই যাব ।

আমি বললাম, তোমার বাবা কি এদেশে চাকরি করেন ?

- বাবা তো ইরান সরকারের এ্যামব্যাসেডর এদেশে । দু-বছর হলো আমরা এসেছি আবার দু-বছর পরে অন্য দেশে চলে যাব ।

- তাহলে তো তুমি অনেক বড় মানুষ ?

এবার নায়লা জোরে হেসে ফেলল । আমি তাকিয়ে দেখলাম নায়লার শ্বেত-শুভ্রত ধারালো দাঁতের ফাঁক গলিয়ে হাজারো নক্ষত্রের আলো এসে পড়ছে । সেই আলোতে আলয় আলয় ভরে উঠল আমাদের টেবিলের ধারটা ।

- তুমি ভুল বললে সাইদ, আমি বড় মানুষ নই । আমার বাবা অনেক বড় মানুষ । কথায় কথায় বড় বড় গান, কবিতা বাঁধতে জানেন । সারা ইরান জুরে বাবার অনেক ভক্ত রয়েছে ।

- তোমার বাবা কি ধরনের গান কবিতা লেখেন ?

- মানুষ আর প্রকৃতি নিয়ে বাবার বেশিরভাগ লেখা । কথায় কথায় জলা জংগল, জোনাকির আলো, বালির উপত্যকা বাবার লেখায় উঠে আসে । বাবার মূল প্রেরণা এসেছে আমার দাদাজির কাছ থেকে । দাদাজি বড় বড় গান, কবিতা আনায়েসে বাঁধতে জানতেন । সেখান থেকে বাবার হাতে খড়ি ।

- তোমার কি এসব লেখার অভ্যেস আছে ?

আমি বললাম, তা ঠিক নেই তবে অন্যের লেখা পড়তে ভাল লাগে । তুমি কোথায় পড়াশোনা করেছ ? নায়লা বললো,

স্কুল আর কলেজের পড়াটা দেশে সেরেছি । বাবা বিলেত গেলে বাকী পড়াটা ওখানে শেষ করি । প্রথমে আর্টের উপর ডিপ্লোমা করি, তারপর ধর্মতত্ব আর দর্শন নিয়ে পড়েছি । কোর্সের শেষে আমাকে প্রজেক্ট করতে হয়েছিল । প্রজেক্টের বিষয় ছিল, ট্রিনিটি ইন ক্রিশ্চিয়ানিজম আর সেইটে করতে ট্রিনিটি সম্পর্কে আরো ভাল ভাবে জানতে পারি ।

- এই ট্রিনিটি কেন বেছে নিলে ? এই ট্রিনিটি নিয়ে কিছু বল ?

নায়লা বলতে শুরু করলো,

বরাবরি ট্রিনিটি নিয়ে আমার আগ্রহ ছিল । তাই ইচ্ছে করে এই টপিকস টা বেছে নিয়েছিলাম । ট্রিনিটি মানেই ত্রিত্ববাদ বা তিনের মধ্যে এক বা একের মধ্যে তিন । খ্রীষ্টিয় দর্শনে বলে যে ঈশ্বর এক এবং একক কিন্তু তার তিনতে সত্বা রয়েছে । পিতা, পুত্র আর পবিত্র আত্মা । পিতা বলতে বোঝায় সেই পরম ঈশ্বরকে যিনি পুত্র বা যিশু হয়ে এসেছিলেন পৃথীবির পরে । আবার তিনিই পবিত্র আত্মা হয়ে মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগান । ঈশ্বরের তিনটে রুপ একই সময় সর্বত্র বিরাজমান এবং তারা সম-ক্ষমতাশীল । তিনি কখনো পিতা, কখনো পুত্র আবার কখনও পবিত্র আত্মা । এই তিন সত্বার উৎপত্তি একই শক্তি থেকে যদিও তিন সত্বা এক নয় । তাদের চাওয়া পাওয়া সম্পুর্ণ সাতন্ত্র্য, আবার কোথায় যেন এদের গভীর মিল । যেমন, যিশু খ্রীষ্ট যখন মর্ত্তে এসেছিলেন, তখন স্বর্গ রাজ্য খালি হয়ে গিয়েছিল

কারণ ঈশ্বর তার পুত্রের মধ্যে দিয়ে এই মর্ত্তে বিরাজ করছিলেন । অতঃপর পৃথীবির পাপ মোচন করতে ঈশ্বর নিজেকে ক্রুশে বিদ্ধ করেন ।

আমি বললাম, তিনে মিলে এক বা একে মিলে তিন, এই ব্যাপারটা একটু খোলাসা করবে ?

নায়লা বলল,

ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে সবচেয়ে সঠিক ব্যাখাটা আমার জানা নেই কারণ এ এক মহা জটিল ব্যাপার । সম্ভবত কারোরি জানা নেই, তাই বিভিন্নভাবে এর ব্যাখা হয়েছে । যেমন ধর, কোন একটি ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্ত আর উচ্চতা রয়েছে কিন্তু এই তিন মাপের অস্তিত্ব কিন্তু এক ঘরকেই কেন্দ্র করেই । খ্রীষ্টান দার্শনিকেরা বলে থাকেন, এই ট্রিনিটি কি বা কিভাবে হলো, সেটা বুঝতে হবে অতীন্দ্রীয় জ্ঞান দিয়ে । খাতা কলমে বোঝানও যাবে না ।

আমি বললাম, তুমি যে খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদের কথা বললে, হিন্দু ধর্মেও তো একি কথাই বলে । ওরাও তো ত্রিত্ববাদে বিশ্বেসী ?

- অনেকটা । খ্রীস্টানীটির সাথে হিন্দু দর্শনের অনেক মিল এই জায়গাতে ।

- তুমি কি একটু ভেঙে বলবে ?

নায়লা হেসে বললো,

বলবো, নিশ্চয় বলবো । খ্রীস্টানীটির ত্রিত্ববাদ তো বলেছি । পিতা পুত্র আর পবিত্র আত্মার সমন্বয়ে ঈশ্বর । অনেকটা একি ভাবে হিন্দু দর্শনে বলে যে, ব্রম্মা, বিষ্ণু আর শিভা এই তিন সত্বাকে নিয়ে যে পরম পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর । এই জগতের দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সব কিছু ব্রম্মা বানিয়েছেন । বিষ্ণু হলো সেই সৃষ্টির ধারক, বাহক ও পালনকর্তা আর শিভার কাজ হলো সেই সৃষ্টির ধ্বংস সাধন । এই তিন সত্বা মিলে জগতের সৃষ্টি, জগতের ধ্বংস আর জগতের ভরণ, পোষণ ও ব্যবস্থাপনা করে থাকেন । এই তিন সত্বার স্বরুপ ও কর্ম-পরিধি সম্পুর্ণ ভিন্ন কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কোন এক জায়গায় ওরা এক এবং অভিন্ন ।

আমি বললাম, ব্রম্মা, বিষ্ণু আর শিভা এই তিনে মিলে এক ঈশ্বর, এইটে একটু খোলাসা করবে ?

- তোমাকে তো আগে বলেছি, তিনে মিলে এক, আবার একে মিলে তিন, এ ব্যাপারটা কখনই ব্যাখা করা যাবে না । হিন্দু সাধুরা ধ্যানের মাধামে বিষয়টা উপলব্ধি করেন কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে পারেন না ।

আমি বললাম, আমরা চাইলেই তো প্রকাশ করতে পারি ?

- না, সব কিছু প্রকাশ করা যায় না । যেমন, তুমি দুঃখ পেয়েছ কিন্তু সেইটে কতটুকু তা অন্যকে হাতে কলমে বোঝাতে পারবে ?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম । মনে মনে ভাবছি ট্রিনিটির কথা আর মেলানোর চেষ্টা করছি । তিনে মিলে এক আবার একে মিলে তিন । বার বার ক্ষেই হারিয়ে ফেলছি ।

নায়লা হেসে বললো, তুমি দিনভর চিন্তা করলেও মেলাতে পারবে না । তার চেয়ে অন্য কথা বলি ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

- ঠিক আছে ।

- এখানে কই থাকো ?

আমি বললাম,

কলেজের ক্যাম্পাসে ছোট্র একটা বাসা পেয়েছি পাহাড়ের খাঁজে । সেই খাঁজ অনেক নিচ পর্যন্ত দেখা যায় । কেমন সবুজে সবুজে ঢেকে থাকে পাহাড়ি খাঁজ ।

- তুমি নিশ্চয় বসে বসে ঐ সব দেখো ?

- হ্যাঁ বলে আমি সায় দিলাম ।

নায়লা বললো, আমারও ভাল লাগে পাহাড়ি খাঁজ, জলা-জঙ্গল আর উপত্যকা ।

আমি বললাম,

তাহলে একদিন আসো আমাদের ওদিকে । তোমাকে না হয় পুরোটা কলেজ ঘুরিয়ে দেখালাম । বিকেল বেলায় পাহাড়ের খাঁজ দেখতে বের হবো । তোমার ভাল লাগবে ।

তারপর একটু থেমে বললাম,

ছেলেবেলায় যে স্কুলে পড়তাম, সেই স্কুল লাগোয়া বিশাল চার্চ । প্রতি রবিবার ওরা প্রার্থনা করত আর যীশুকে নিয়ে গান গাইত । সেই গানের সুর আর পরিবেশনা এতো চমৎকার ছিল যে, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম । একদিন প্রার্থনার সময় একজন দাঁড়িয়ে বললো, আমার প্রভুকে যখন গাছের সাথে বিদ্ধ করা হয়, তখন তোমরা কোথায় ছিলে ? আমার প্রভুকে যখন চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়, তখন তোমরা কোথায় ছিলে ?

নায়লা বললো,

বাইবেলে লেখা আছে, সেই সৌভাগ্যবান, যার জীবন কাটলো দুঃখ, কষ্ট আর পনকিলতার মধ্যে দিয়ে কারণ স্বর্গ রাজ্য তারি জন্য ।

আমি বললাম, তাহলে কি ধর্ম শাস্ত্রে সুখ, আহলাদ করতে মানা করা হয়েছে ?.

নায়লা বললো,

আমরা ধনী হবো, বিজ্ঞানী হবো, ধর্মে এতে নিষেধ নেই কিন্তু তোমার অর্জনকে অবশ্যই মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে । তুমি বিজ্ঞানী হলে সেই বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে, চিকিৎসক হলে অসুস্থের সেবায় আর ধনী হলে দারিদ্রের সেবায় ব্যয় করতে হবে । তুমি একা একা ফুলে ফেপে বড় হয়ে নিরন্তর ভোগ করে যাবে, সেটা ইসলামে অনুমতি নেই ।

আমি বললাম,

তুমি আমাকে আলফ্রেড নবেলের কথা মনে করিয়ে দিলে । আলফ্রেড নবেল ডিনামাইট আবিস্কার করবার পর তার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে । তিনি মূলত ডিনামাইট আবিস্কার করেছিলেন বড় বড় পাহাড় গুড়িয়ে টানেল বানানোর জন্য, শিলা আর পাহাড় ভেঙ্গে খনির প্রসারতা বারাবার জন্য কিন্তু এই ডিনামাইট ফাটিয়ে পরবর্তিতে যে বড় বড় হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন হবে, তা তিনি ভেবে দেখেননি । কিছুদিন পর আলফ্রেড নবেল বুঝতে পাড়লেন সে কথা । তিনি ভেবে দেখলেন তার এই আবিস্কার মানুষের কল্যাণের পাশাপাশি অকল্যাণে ব্যয় হবে ব্যাপক পরিসরে । তখন তিনি অনুশোচনায় ভুগতে লাগলেন কিন্তু সমস্যা হলো যেটা একবার অবিস্কার হয়ে গেছে, তা তো আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না । তিনি বিকল্প ভাবতে লাগলেন যা দিয়ে মানুষের ওই পরিমান কল্যাণ করা যাবে । অতঃপর তিনি তার সমস্ত সম্পদ দান করে গেলেন, যা দিয়ে মানব কল্যাণের জন্য যেই কাজ করবে, তাকে যেন পুরষ্কৃত করা হয় । আজকের যে নবেল পুরস্করের কথা আমরা শুনি, সেটা আলফ্রেড নবেলের চেষ্টার মিষ্টি ফসল ।

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম বেলা একটা বেজে গেছে । বিকেল দুটায় একটা ক্লাস আছে । এখন না উঠলেই না কিন্তু সামনে বসা এই অপ্সরীকে রেখে কিছুতেই মন উঠছে না । তারপর এই বলে উঠে দাঁড়ালাম, যদি অনুমতি দাও তো উঠি । দুটায় একটা ক্লাস আছে ।

- নিশ্চয় । আমাকে সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ । কবে আসছ বাবা-মার সাথে দেখা করতে ?

- খুব শীঘ্রই । আমার ফোন নাম্বারটা রাখো ।

নায়লা আমার নাম্বারটা টুকে নিল ।

আর্ট স্কুল থেকে আমার কলেজের দূরত্ব এক ঘন্টার পথ । পাবলিক বাসে চড়ে বসেছি । বাস ছেড়েছে অনেকক্ষণ । মালয়শিয়ার আধুনিক হাইওয়ে মাড়িয়ে এগুচ্ছে বাসের চাকা । রাস্তার দুধারে গভীর জলাভূমি আর পাহাড়ী পথ । সে দিকে মন দিতে পারছি না কিছুতেই । কেবলি মনে হতে লাগল, এই যে নায়লার সাথে পরিচিতি হওয়া, এই যে পাহাড়ের ধারে দুজনের বসে থাকা, এর যেন কখনো শেষ না হয় ।

তৃতীয় অধ্যায়

মালয়শিয়ার গল্প

বাংলাদেশ থেকে মালয়শিয়ার দূরত্ব কত ? ঠিক ঠিক মতন উড়োজাহাজ উড়লে চার ঘন্টায় কুয়ালালামপুর পৌঁছানো যায় । আকাশ পথে দূরত্ব কম হলেও উন্নতির দিক থেকে এরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে । মনটা খারাপ হয়ে গেলো এই ভেবে, আমাদের এত মানব-সম্পদ থাকতে আমরা কেন পিছিয়ে আছি ? আমাদের খুব কাছের দেশগুলো কেমন তর তর করে উপরে উঠে গেল ।

আজ থেকে অনেক বছর আগে পৃথীবির দেশ গুলো সাতন্ত্র্য ভাবে বেড়ে উঠার চেষ্টা করতো কিন্তু পরবর্তিতে দেখা গেছে এককভাবে বাড়তে গেলে খুব একটা এগুনো যায় না । তাই আন্চলিক জোট করে, আন্চলিক ভাবে বেড়ে উঠার চেষ্টা চলছে । ফলে গড়ে উঠেছে ইউরোপিও ইউনিয়ন, আসিয়ান আর সার্কের মতন বড় বড় জোট । ইউরোপিও ইউনিয়ন আর আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো জোটের মাধামে ভাগ্যের অনেক পরিবর্তন এনেছে গত চার দশকে কিন্তু জোটের ফসল আজও ঘরে তুলতে পারেনি সার্কভুক্ত দেশগুলো । দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশ নিয়ে সার্ক গঠিত যেমন, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ ।

এশিয়া মহাদেশে ব্রিটিশরা শক্ত ঘাটি করেছিল ভারত-বর্ষে । ঝাড়া দুই শত বছর শাসন করবার পর আন্দোলনের চাপে ওরা হাত-পা গুটিয়ে চলে যায় । তখন কেবল মাত্র দ্বীতিয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয়েছে । পৃথীবি তখন ব্যস্ত যুদ্ধ উত্তর পৃথিবী গড়বার কাজে । ভারতবর্ষের সদ্য স্বাধীকার প্রাপ্ত দুই দেশ ভারত আর পাকিস্তানও বসে নেই । তারাও নেমে গেছে নিজ নিজ দেশ গড়ার কাজে । নিজেদের গড়ে তুলবার পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে পারস্পারিক অবিশ্বাস আর দূরত্ব বাড়তে থাকে । বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয়েছে বটে কিন্তু শুরু হয় আন্চলিক যুদ্ধ । ভারত আর পাকিস্তান পর পর অনেকগুলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে গত পাঁচ দশকে ।

ভারত আর পাকিস্তানেরর মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ জিগির পুরো সার্ক অন্চলকে অস্তির করে রেখেছে । দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়েছে বার বার । আন্চলিক জনগোষ্টির মধ্যে বেড়েছে পারস্পারিক অবিশ্বাস যা সামগ্রিক অর্থনীতিতে ফেলেছে ঋনাত্বক প্রভাব । আশার কথা হলো, অধুনা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ জিগিরটা কমে এসেছে ফলে দেশি-বিদেশী বিনিয়গ বাড়ছে । ভারত পৃথীবির অন্যতম শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্বপ্রকাশ করতে যাচ্ছে ।

অনেক জ্ঞানী-গুণীরে বলে থাকেন ভারত-পাকিস্তান বিরোধের মূলে আছে ধর্ম । অনেকে সেটা মানতে রাজি নন । অসিয়ানদের মধ্যে কেউ মুসলিম, কেউ বুদ্ধ আবার কেউবা খ্রীষ্টান । কই তাদের মধ্যে তো ধর্ম নিয়ে রেশারেশি নেই ? না আছে সীমান্তে গোলাগুলি । অনেকে বলে থাকেন, ভারত-পাকিস্তান বিরোধের মূলে আছে নেতৃত্বের কোন্দল । দু-দেশই চায় এই অন্চলের নেতা হতে, এ অন্চলকে শাসন করতে । আবার অনেকে বলেন, অমীমাংসিত কাস্মির ইস্যু হলো সব বিরোধের মূলে । কারণ যেটাই হোক না কেন, এই আন্চলিক বিরোধ দেড়শ কোটি মানুষের জীবিকাকে বাধাগ্রস্ত করছে ফলে কোন ভাবেই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যাচ্ছে না ।

তবে জোট করে সবচেয়ে বেশি অর্জন করেছে ইউরোপের দেশগুলো যাকে আমরা ইউরোপিও ইউনিয়ন বলি । অভিন্ন মুদ্রা, অভিন্ন রাজস্ব আর অভিন্ন কৃষি নীতি করতে পেরেছে ওরা । কথায় কথায় এখন ইউরোপিও নীতির কথা চলে আসে । একক ইউরোপিয়ান দেশ হিসেবে কোন নীতি থাকলে তা দিন দিন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ।

অন্যদিকে, আসিয়ানরা নিজেদের মধ্যে শক্ত বাঁধনের কারণে আজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে । দারিদ্র কমেছে, শিক্ষার হার বেড়েছে, দেশি-বিদেশী বিনিয়গ বেড়েছে লক্ষ্যনীয়ভাবে । দেশি-বিদেশী বিনিয়গের তালিকায় মালয়শিয়া শীর্ষস্থানীয়দের জায়গায় নাম লিখিয়েছে ।

আজ থেকে প্রায় পন্চাশ বছর আগে মালয়শিয়া স্বাধীন হয়েছিল । আজ অবধি পাঁচজন প্রধানমন্ত্রী এ দেশের হাল ধরেছেন । যদিও সবার আমলেই উন্নতি হয়েছে প্রভূত কিন্তু শহর আর শিল্প ভিত্তিক উন্নয়নের সু-বাতাস বইতে শুরু করে আশির দশকের গোড়া থেকে যখন মাহাথির মোহাম্মদ এ দেশের হাল ধরেন । নিরবিচ্ছিন্ন বিশ বছর শাসন আমলে সে জনগনকে বোঝাতে পেড়েছে লেখাপড়াটাই

আমাদের প্রধান কাজ । একমাত্র শিক্ষিত জনগোষ্ঠিই পারে দেশকে এগিয়ে নিতে । এই তো কিছুদিন আগে জাতীয় বাজেট পেশ করলেন মালয়শিয়ার সরকার । শিক্ষা খাতে বিপুল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে পূর্বেকার সব বাজেটের মতন । এদেশের বিপুল সংখ্যক ছেলে-মেয়েদের এদেশের সরকার বিদেশ থেকে পড়িয়ে আনে । এরাই একদিন দেশে ফিরে গড়ে তুলে সামগ্রিক অবকাঠামো ।

বেশি দিন আগের কথা নয় । আজ থেকে দুই দশক আগে এদেশের ছেলে মেয়েরা বাংলাদেশে পড়তে যেতো । সে দৃশ্যপট পাল্টে গেছে এখন । এখন বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এ'দেশে পড়তে আসে কারণ এ'দেশেই এখন গড়ে উঠেছে অনেক মান সম্পন্ন শিক্ষালয় ।

তিন ধরনের অর্থনীতি হতে পারে যেমন কৃষি নির্ভর, শিল্প নির্ভর আর জ্ঞান নির্ভর বা নলেজ ইকোনমি । এই নলেজ ইকোনমি ধারনাটা নূতন এসেছে যার অর্থ হলো অর্থনীতির সকল কর্মকান্ড নলেজ বা সৃজনশীলতা দ্বারা পরিচালিত হবে । পাশ্চাত্য বিশ্ব কৃষি আর শিল্প নির্ভর অর্থনীতি পেরিয়ে এখন নলেজ ইকোনমিতে অবস্থান নিয়েছে । তারা তৈরি করছে মহা মূল্যবান নলেজ বিশেষিত দ্রব্য-সামগ্রী যেমন সফটয়্যার, টেলিকম্যুনিকেশন ইত্যাদি । এই সাত রাজার ধন উৎপাদনের সুবাদে বিশ্ব আয়ের শতকরা আশি ভাগ তারা নিজেদের ঘরে তুলতে পেরেছে ।

তবে মালয়শিয়া এখনো জ্ঞান নির্ভর অর্থনীতি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি । শিল্প এখনও এদেশের প্রধান চালিকা শক্তি তবে চেষ্ঠা চলছে ব্যাপক পরিসরে দেশকে নলেজ ইকোনমিতে উত্তরণের জন্য । সেই লক্ষ্যে শিক্ষা খাতে বিপুল বিনিয়োগ হয়েছে, ইনভেনশন-ইনোভেশন কে উৎসাহিত করা হচ্ছে আর তথ্য-প্রযুক্তি দিয়ে মুরে ফেলা হচ্ছে সারা দেশ । যে দেশের কাছে যত তথ্য রয়েছে, সে তত এগিয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক ।

ISBN No. 978-983-43934-3-4

চতুর্থ অধ্যায়

কাপরের মেলা

ঝারা তিন ঘন্টা ঘুমিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি সূর্য ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে । শত-শত ফিট পাহাড়ের উপর আমার বাঙলো । তাই সূর্য ডুবো সহজেই চোখে পড়ে ।

পাশের শহরে মেলা শুরু হয়েছে কদিন হলো । চল্লিশটি দেশ তাদের বুনানো কাপড় নিয়ে হাজির হয়েছে মেলায় । ঠিক করলাম সন্ধ্যের পর বের হব মেলা দেখতে ।

ভাল করে সাওয়ার সেরে হাত পা মুছে নিয়েছি তারপর ইস্ত্রি করা জামা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম । এক ঘন্টার ড্রাইভ । দেখতে দেখতে মেলা চলে এলো । মেলা থেকে নির্গত আলোর ফানুষ দূর থেকে চোখে পড়ছিল । কাছে আসতে বুঝলাম বিশাল এলাকা জুড়ে বসেছে পসার ।

কোন কোন দেশ মেলা বসিয়েছে, তার একটা লিস্ট পাওয়া গেল । ওই লিস্টে বাংলাদেশর নাম চোখে পড়লো । ঠিক করলাম এ্যালফ্যাবিটিক্যালি দেশের নাম ধরে স্টল দেখব । প্রথমে শুরু হলো আলজেরিয়া দিয়ে । হরেক রকম কাপড়ে স্টলটা ঠাসা । গালিচা থেকে শুরু করে হরেক রকমের কাপড়ে ছেয়ে আছে স্টলটা ।

কেউ একজন এগিয়ে এসে সবিনয়ে জানতে চাইল, স্যার কিছু লাগবে ?
আমি বললাম, একটু দেখি, তারপর বলছি ।
লোকটা বিনয়ের সাথে বললো, কিছু দরকার হলে বলবেন । আমি ওই দিকতাটে আছি, এই বলে সাদা আলখেল্লা পড়া আরবীয় যুবকটা চলে গেল ।

ঘুরতে ঘুরতে ভুটানের স্টলে এলাম । দেখলাম অনেক লোকের ভিড় । সবাই হুমড়ি খেয়ে কি যেন দেখছে । এতো ভিড় ভাট্টায় যেতে মন চাইল না । ভাবলাম গলাটা একটু ভিজিয়ে নেই । পাশেই প্যানডেল টানিয়ে চা পানিয়র ব্যবস্থা করেছে মেলা কতৃপক্ষ । টেবিলের কাছে আসতে মাঝারি বয়সের এক যুবক এগিয়ে এল ।

এক গ্লাস চায়ের অর্ডার দিলাম ।

দূর থেকে দেখলাম এক দীর্ঘাঙীনী আমার দিকে হন হন করে এগিয়ে আসছে, পরিচিত বলে মনে হলো । কাছে আসতে বুঝলাম, নায়লা । আমার নায়লা, যার কথা গত দিনগুলোতে একবারও ভুলতে পারিনি ।

নায়লা এসে বললো, কখন এসেছ ?

- এই তো এলাম, তুমি ?

- অনেকক্ষণ । বাড়ি ফিরছিলাম কিন্তু তোমাকে দেখে ভাবলাম দুই-একটা কথা বলে যাই ।

আমি হেসে বললাম, চা কফি কিছু খাবে ?

- এক গ্লাস পানি খেতে পারি । তারপর বললো, কি কি কিনলে ?

- এখনো কিনিনি, তুমি ?

- হাসানের মাজারের জন্য গিলাপ নিলাম, এই বলে গিলাপটা মেলে ধরলো নায়লা ।

আমি দেখলাম লম্বা-চওড়া সাদা কাপড়ের উপর হলুদ সুতোর কাজ । গিলাপের মাঝখানে সবুজ সুতো দিয়ে আল্লাহু বুনানো । সেই আল্লাহুর ধার ঘেঁষে লতাপাতার ঘেরা । কাপড়ের পরশ যে এতো মোলায়েম হয়, সেই প্রথম অনুভব করলাম ।

আমি বললাম, হাসানের ইন্তেকালের দিনটা যেন কবে ?

- পহেলা জানুয়ারি ।

- তোমরা কি সবাই যাচছ ?

- প্রতি জানুয়ারির এক তারিখে আমাদের পাবে হাসানের মাজারে । ডিসেম্বরের শুরু থেকে বাবা-মা রোজা রাখতে শুরু করেন, সেটা চলে জানুয়ারি পর্যন্ত । মাজার যিয়ারত করে, তিন দিন থেকে আমরা ফিরে আসি তোমাদের দেশ থেকে । এরপরে দেশে যাবার আগে আমাকে ফোন দিতে পারবে ?

- নিশ্চয় জানাব । তোমার নাম্বারটা দাও ।

- প্যাডে নাম্বারটা লিখে দিল নায়লা । বড় বড় হরফে লেখা । অল্পতেই পাতা ভরে এলো ।

নায়লা বললো, জানুয়ারিতে দেশে যাচ্ছ ?

- না, পরীক্ষা চলবে তখন ।

- তাহলে কবে যাচ্ছ ?

- মে'র শেষে কারণ তখন ছুটি-ছাটা আছে আর তাছাড়া বর্ষা শুরু হচ্ছে বাংলাদেশে । বর্ষাকাল না দেখলেই না ।

নায়লা হেসে দিল । কিছু বললো না ।

আমি বললাম,

বাংলাদেশের বর্ষা অন্যরকম । বৃষ্টি একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না, তাই আমার বাবা উঁচু করে গ্রামের বাড়ি বানিয়েছেন, যেন বর্ষার পানি উঠোনা না উঠে । আমি সারাদিন জানালার পাশে বসে বৃষ্টি পড়া দেখি । গভীর রাতে যখন টিনের চালে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে, তখন মনে হবে হাজারো শিশির, হাজারো শব্দে আছড়ে পড়ছে বাড়ির ছাদে । কেমন যেন শীত শীত করতে থাকে তখন । মাথার কাছে সব সময় লেপ কাথা দেয়া থাকে । সেখান থেকে চাপিয়ে নেই । রাত যত বাড়বে, বৃষ্টি-হাওয়ার দাপাদাপি ততই বাড়বে ।

নায়লা বলল, এ যে দারুণ কাহিনী । আমারও যে শীত শীত করছে ।

আমি হেসে বললাম,

ভড়া বর্ষায় যখন পূর্ণিমা উঠে, তখন মনে হবে তুমি বুঝি একাই ভাসছো । যতদুর চোখ পড়ে, শুধুই পানি । সেই পানির পরে পূর্ণিমা ঝিকিমিকি তোমাকে নিয়ে যাবে রুপকথার দেশে ।

নায়লা বলে উঠল, এ রুপকথা যে না দেখলেই না ।

আমি হেসে ফেললাম । কিছু বললাম না ।

নায়লা বলল,

আমি বাড়ি ফিরে যাব কারণ রাত অনেক হয়েছে । কূটনৈতিক পাড়ার বাসিন্দাদের বেশি রাত অবধি বাইরে থাকার অঘোষিত নিষেধাঙা আছে । তুমি ফিরবে ?

- চল তোমাকে এগিয়ে দেই ।

আমরা দুজন মেলার বাইরে চলে এলাম ।

নায়লা বলল, আমার বাড়ি এখান থেকে খুব কাছে, তাই হেঁটে এসেছি । আবার হেঁটে ফিরে যাব ।
আমি সবিনয়ে জানতে চাইলাম, তোমাকে কি বাড়ি পর্যন্ত সংগ দিতে পারি ?
নায়লা হেসে দিল । কিছু বললো না ।

আমরা হাঁটা দিলাম জালান আমপানগের ফুটপাথ দিয়ে । ডানদিকে হিমালয়ের মতো উঁচু হয়ে আছে পেট্রোনাস টাওয়ার, শত শত অফিসে ঠাসা । জালান আমপানগের শেষ মাথায় নায়লাদের বাসা । এখান থেকে এক কিলোমিটার হবে ।

জালান আমপানগের দু-পাড়ে সুপ্রসস্ত ফুটপাথ । সেই ফুটপাথ জুড়ে শোভা পাচ্ছে হাজারো সবুজের গাছ । কিছুদূর পর-পর দাড়িয়ে আছে সুদৃশ্য লাইটপোস্ট । লাইটপোস্টের নিয়ন আলো নায়লার মুখে পড়তেই আমার মনে হলো, আমি অকস্মাৎ এই পৃথিবী থেকে সটকে পড়েছি । অতঃপর, এক মহামায়ার হাত ধরে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে কেবলি ছুটে ফিরছি
নায়লা বললো,

বাংলাদেশের অনেক কবিদের কথা আমি জানি । যেমন, জীবনানন্দ দাশ যিনি বাংলাদেশের প্রকৃতি নিয়ে লিখতেন । আমার বাবা তার একজন বিশিষ্ঠ ভক্ত । বাবার লাইব্রেরিতে উনার ছবি, বই দেখেছি । তুমি পড়েছ নিশ্চয় ?
আমি বললাম,

জীবনানন্দ দাশ পড়েনি এ রকম লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে বাংলাদেশে । অনেকে কি বলে জান ?
- কি বলে ? নায়লা জানতে চাইলো ।
- যদি কখনও বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যায় অথচ জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থ টিকে থাকে, সেক্ষেত্রে বলে দেয়া যাবে বাংলাদেশর স্বরুপ কেমন ছিল ।
নায়লা বলল, জীবনানন্দ দাশের দুই এক লাইন শোনাতে পারবে ?
- সেভাবে আমার মনে নেই, তবে ছাত্রজীবনে খুব পড়তাম । এখন সে সব ভুলে গেছি ।

নায়লা মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কিছু বল ?

- রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কোন নাড়ি নেই । শিল্প সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই, যেখানে তিনি বিচরণ করেননি । তবে সব কিছু ছাপিয়ে বাংলাদেশের বর্ষা তার সাহিত্যে সর্বময় স্থান করে নিয়েছে । তার লেখায় বর্ষার কথা উঠে এসেছে বার বার । রবীন্দ্রনাথকে তাই বর্ষার আবিস্কারক বলা হয় ।

তারপর একটু থেমে বললাম, রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে মজার একটা ব্যপার চালু আছে, শুনবে ?

- প্লিজ বল ।

আমি বলতে শুরু করলাম, একবার এক রবীন্দ্রপাঠক বলে উঠেছিলেন, রবি-ঠাকুরের লেখা পড়তে লম্বা চওড়া ছাতা নিয়ে বসতে হয় ।

তখন আরেকজন জিঙাসা করল, কেন, ছাতা কেন ? সাহিত্য পড়তে আবার ছাতা লাগবে কেন ?

পাঠক উত্তর করলো, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কথায় কথায় বৃষ্টি নামান, তাতে ছাতা ছাড়া উপায় কি ?

নায়লা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, শুনেছি রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো ভাই বোন ছিল ।

- এই অনেকগুলো ভাই-বোন নিয়ে মজার একটা গল্প আছে, নায়লার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করলাম, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পরিবারের নবম সন্তান । কোন কারণে রবীন্দ্রনাথের বাবা-মা যদি জন্ম-শাষন করতেন, সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হতো না ফলে বাংলা ভাষা এতো নামি-দামি হয়ে উঠতো না কখনই ।

নায়লা বলল, আমাদের দেশে অনেক কবি জন্মেছেন । তুমি নিশ্চয় রুমি, জামি, শেখ সাদি, ওমর-খৈয়ামের নাম শুনেছ ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

নায়লা বলল, এদের সবাই কিন্তু খুদার ইশক আর আধ্যাত্বিকতা নিয়ে লিখতেন । বাংলাদেশের অনেকে সে সব বাংলায় অনুবাদ করেছে । তুমি কি পড়েছ সে সব ?

- রুবাইয়াত ওমর খৈয়াম পড়েছি বাংলায় । শেখ সাদির গুলিস্তা আর বোস্তার বাংলা অনুবাদ দেখেছি কিন্তু এখনো পড়া হয় নি ।

নায়লা বললো,

উনারা একাধারে যেমন কবি ছিলেন, তেমনি সব সময় খুদার প্রেমে মত্ত থাকতেন । হাজার হাজার রাকাত নামাজ পড়ে যখন এক কদম আগানো যায়, তখন খুদার প্রেমিকেরা ইশকের এক হুংকারে খুদার আরসে গিয়ে হাজির হন । খুদার প্রেমিকাদের আমরা সূফী বলি ।

- এই সূফী শব্দটা কি তোমাদের দেশেই তৈরি ?

নায়লা উত্তর করল,

তাদেরকে আমরা সূফী বলি যারা খুদার সত্বা নিয়ে গবেষণা করেন । এই সূফীদের উৎপত্তি কিন্তু খোদ মদিনা মনোয়ারায় । নবীজির আমলে একদল সাহাবা নবীর মসজিদের বারান্দায় অবস্থান নিয়েছিল । তারা সর্বদাই এবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকতেন । তাদেরকে আহালুস সুফফাহ বা বারান্দার অধিবাসী বলা হতো । সম্ভবত এই আহালুস সুফফাহ থেকেই সূফী শব্দের উৎপত্তি ।

আমি বললাম, একজন সূফীর কথা শুনেছিলাম । সম্ভবত উনি তোমাদের ঐ দিককার বাসিন্দা । নাম মনসুর হাল্লাজ ।

নায়লা হেসে বলল,

মনসুর হাল্লাজ কে চেনে না এরকম মানুষ আরব বিশ্বে পাওয়া কঠিন হবে । তিনি খুদার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন আর তখনি ঘটে বিপর্যয় । তিনি বলতে শুরু করেন, আনাল হক, আনাল হক অর্থাৎ আমিই খুদা । নিজেকে খোদায়ী দাবি ধর্ম শাস্ত্রে বড় অপরাধ । সেজন্য তাকে কতল করা হয়েছিল ।

- মনসুরের এ অবস্থা হলো কি করে ?

নায়লা একটু থেমে উত্তর করল,

মনসুরের খুদায়ী দাবি তার সজ্ঞানে হয়নি । তিনি খুদার সাথে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিলেন যে কোন ভাবেই নিজেকে আলাদা করতে পারছিলেন না । ফলে যা হবার তাই হলো ।

- তাহলে কি মনসুর খুব বড় মাপের সূফী ছিলেন ?

নায়লা বললো,

এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত । অনেকে বলে থাকেন, মনসুর খুব সাধারণ মাপের সূফী ছিলেন তাই খুদা প্রেমের সামান্য রস পান করেই তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন । তার আর শেষমেষ খুদা তত্বের পুরো জ্ঞান অর্জন হয়নি ।

মানব আত্মা নিয়ে সূফীদের ব্যাখা কি নায়লা ?

- মানব-আত্মার দুই ভাগ । এক ভাগ নফস, আরেক ভাগ রুহ । নফস আমাদের খারাপ কাজে নিয়ে যায় । অন্যদিকে রুহ চায় আমরা ভাল কাজ করি । তাই নফস আর রুহের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ চলে । যখন রুহ জিতে গেল, মানুষ ঝুঁকে পড়ে ভাল কাজে আর নফস জিতে গেলে অন্ধকার পথি মানুষের ঠিকানা ।

- এ যে দারুণ ইনফোরমেশন । নফসকে পরাস্ত করবার উপায় কি ?

নায়লা বলতে লাগলো,

অল্প আহার, অল্প নিদ্রা নফসের প্রধান শত্রু । যখনি নফস দূর্বল হল, রুহ শক্তিশালি হয়ে উঠে । তোমার মন প্রাণ ভাল কাজের দিকে ঝুঁকে পড়বে । সূফীরা তাই অল্প নিদ্রা, অল্প আহার করতে পছন্দ করেন ।

- এই নফস আর রুহের দ্বন্দ কতদিন চলবে নায়লা ?

- যতদিন দেহে প্রাণ আছে ততদিন । কেউ কাউকে ছাড়ছে না ।

- তাহলে সূফীদের বৈশিষ্ট কি দাঁড়ালো ? কিভাবে আমরা তাদের চিনবো ?

নায়লা বলতে শুরু করলো,

সূফীদের প্রধান বৈশিষ্ট হলো, দুঃখের দিনগুলোতে ওরা আনন্দ প্রকাশ করবে । ক্ষুদার্ত অবস্থায় তৃপ্তির ভাব দেখাবে । ধনী লোকদের সামনে অভাবশুন্য অথচ ফকিরদের নেক নজর আশা করবে । কেউ কোন সুবিধে সাধলে বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করবে ।

আমি বললাম,

এই বৈশিষ্টগুলো যার আছে, তিনি তো পুরো মানুষ নন । অর্ধেক মানব, অর্ধেক অশরীরী ।

- হ্যাঁ, সূফীরা তাই, নায়লা উত্তর দিল ।

আমি বললাম, এই সূফীরা কি খুদাকে দেখতে পায় ?

নায়লা বলল,

আমাদের দেশে একজন সূফী ছিলেন । তিনি একবার চিৎকার করে বলেছিলেন, খুদাকে না দেখলে তার উপাসনা করতাম না । মেরাজের রাতে নবীজি যখন ছিদরাতুল মোনতাহা পার হয়ে খুদার সান্নিধ্যে গেলেন, তখন খুদার সাথে নবীজির দূরত্ব ছিল ধনুকের সাথে জ্যার দূরত্বের সমান । নবীজি যেহেতু চর্ম চোখে খুদাকে দেখেছেন, সূফীদের পক্ষে খুদা দর্শন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয় ।

একটু থেমে আমি জানতে চাইলাম, সূফীরা কি শেষ পর্যন্ত সত্য খুঁজে পায় ?

- জান সাইদ, তুমি যে ধর্মই মন দিয়ে পালন কর না কেন, দেখবে তোমার মধ্যে একটা শক্তির জন্ম নিয়েছে । হিমালয়ের পাদদেশে যে সব মুসলিম, হিন্দু আর বৌদ্ধ সাধুরা ধ্যান অর্চনায় সময় কাটান, তারা অনেকেই ক্ষমতাশীল । ধ্যানের মাধ্যমে অনেক অদৃশ্য ক্ষমতা ওদের মধ্যে চলে আসে ফলে অনেক আলৌকিকতা ওরা দেখাতে পারে কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র দুই একজন সত্যের সন্ধান পেয়েছে ।

আমি বললাম, যার মধ্যে অদৃশ্য ক্ষমতা এলো, তার পক্ষে তো সত্য খুঁজে পাওয়া শক্ত নয় ?

- সত্য খুঁজে পাওয়া এক জিনিষ আর নিজের মধ্যে ক্ষমতার জন্ম নেয়া অন্য জিনিষ । অত্যাধিক উপাসনার মাধ্যমে যে কেউ ক্ষমতাধর হয়ে উঠতে পারে । পারে নানা ভেল্কি দেখাতে কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র গুটি কয়েকজন সত্যের সন্ধান পেয়েছেন ।

- তা হলে কারা সত্য জানতে পারছে ?

নায়লা বলতে শুরু করল,

আমরা এখন যে জগতে বাস করছি, সেটা আপেক্ষিক জগত । এই জগতের সব কিছুই আপেক্ষিক সত্য । তবে পরম সত্যটা জানতে হলে পরম জগতের বাসিন্দা হতে হবে ।

আমি বললাম, তাহলে কি সূফীরা কখনো পরম সত্যটা জানতে পারবে না ?

- পারবে যদি তারা আপেক্ষিক জগতের সীমানা পেরিয়ে কোন ভাবে পরম জগতে ঢুকে পড়তে পারে ।

- কোথায় গেলে পরম জগত পাওয়া যাবে, নায়লা ?

নায়লা বলল,

আমাদের এই আপেক্ষিক জগত আর পরম জগত একই জায়গায় অবস্থান করছে কিন্তু দুই জগতের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা পর্দা থাকাতে আমরা পরম জগত দেখতে পাই না । পরম জগতের বাসিন্দারা অনায়েসে আমাদের এখানে আসেন তারপর কাজ ফুরুলে ফিরে যান । সূফীদের চেষ্টা হলো সেই পর্দা মাড়িয়ে পরম জগতে প্রবেশ করা । খুদার প্রতি ঈশকের কারণে পর্দা আর বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে না । ঢুকে পড়ে সূফী পরম জগতে । যখনি সূফী পরম জগতে প্রবেশ করলো, পরম সত্যটা জানতে শুরু করলো ।

আমি রসিকতা করে বললাম, তোমারও কি সেই পরম জগতে যাতায়াতের রাস্তাটা জানা আছে নাকি ?

নায়লা হেসে দিল । কিছু বলল না ।

দেখতে দেখতে জালান আমপানগের শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছি । এখানে কোথাও নায়লাদের বাসা । ডান পাশে প্রসস্ত গলি নেমে গেছে । নায়লার পিছু পিছু গলিতে নেমে এলাম ।

নায়লা বলল, ওই ডান দিকের বাড়িটাই আমাদের । ভেতরে এসো ।

আমি বিনয়ের সাথে বললাম, ধন্যবাদ । অন্যদিন আসব ।

নায়লা বলল,

আমাকে সংগ দেবার জন্য ধন্যবাদ । তোমাকে একবার আসতে হবে বাবা-মার সাথে দেখা করতে ।

- সেত বটেই কিন্তু তোমার বাবা এতো দামী মানুষ যে আমার ভয় লাগে ।

নায়লা হেসে বলল, বাবা একদম মাটির মানুষ । তুমি কথা বললেই বুঝতে পারবে ।

- নায়লাও কি বাবার মতন মাটি দিয়ে তৈরি ?

নায়লা বললো,

তুমি কদিন আমার সাথে ঘুরলেই বুঝতে পারবে তবে মানুষ হিসেবে আমি খারাপ না । সমস্যা একটাই আর তা হলো বাবার মতন কথায় কথায় গান বাঁধতে পারি না আর পারি না বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে ।

আমি বললাম, মেয়েরা রাগ করে থাকবে, সেটাই তো সুন্দর । তুমি বরন্চ তোমার অভ্যেসটা পাল্টে ফেল ।

- তোমার জন্য পাল্টাবো ?

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, তা ঠিক বলছি না । এমনি এমনি বললাম ।

- এমনি এমনি বলবে না । যা সত্যি মনে হবে, সেটাই শুধু বলবে ।

আমি বললাম,

ঠিক আছে, তাহলে সত্যি সত্যি বলছি, তোমার রাগ করার অভ্যেসটা ছেড় না । রাগ করলে তোমাকে দারুণ লাগবে ।

নায়লা হেসে দিল । কিছু বললো না ।

আমি ডাকলাম, নায়লা ।

- বল ।

আমি বললাম, না কিছু না । অন্য দিন বলবো ।

- ঠিক আছে, অন্য দিন বোলো ।

- তোমার দেশে কে কে আছে, সাইদ ?

- বাবা-মা নেই । ভাই-বোনরা আছে । সবারি বিয়ে হয়ে গেছে । ছেলেপুলে নিয়ে সাজিয়েছে সংসার ।

- আর কেউ নেই তোমার ?

আমি বললাম, তুমি যার কথা জানতে চাইছ, সে রকম কেউ নেই । অনেক আগে ছিল । সে কথা রাখেনি ।

- কথা রাখেনি কেন ? নিশ্চয় তুমি যত্ন নাও নি ?

- যত্নের কোন ত্রুটি হয়নি নায়লা । যে যাবার সে চলে যায় । তাকে ফিরানো যায় না ।

- তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ, তাই না ?

আমি চুপ হয়ে গেলাম ।

- আমাকে বলতে পারো সাইদ । হয়তো সাহায্য করতে পারবো ।

আমি বললাম, হু । তোমার অনুমান টাই ঠিক ।

- একজন প্রেমিকের জীবন কষ্টে কষ্টে ভরা । সবচেয়ে ভাল ভুলে যাও সে সব কথা ।

- মানুষ কি সব ভুলতে পারে, নায়লা ?

এবার নায়লা চুপ হয়ে গেল তারপর মাথা তুলে বললো, না । তা পারে না । অনেক স্মৃতি আছে, শেষ দিন পর্যন্ত তাড়িয়ে ফেরে । আর কি কি তোমার মনে পড়ে ?

- আর কি কি ?

- হু ।

আমি বলতে শুরু করলাম,

মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা । সেই যে গুড্ডি নিয়ে দৌড় দেয়া । বাজার থেকে ঢাউস আকারের গুড্ডি নিয়ে আসতাম তারপর উড়িয়ে দিতাম পাখা । সেই পাখায় ভর করে হারিয়ে যেত গুড্ডি গুলো তারপর সুতোর টান পড়লে আবার ফিরে আসতো । আবার সুতো ছাড়তাম । ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতো নীলিমায় ।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলাম,

তারপর সকাল হলে পুরোনা ঢাকার অলি-গলি মাড়িয়ে স্কুলে হাজির হতাম । সারাদিন ক্লাস চলতো । বিকেলে ফিরে আসতাম বাসায় । বাসায় এসে দেখতাম আমার মা গরম গরম পিঠা ভেজেছেন । অনেকগুলো খেয়ে ফেলতাম এক সাথে । বাড়ির পাশেই বিবেক আর মইনের বাসা । গিয়ে হাজির হতাম ওদের ওখানে । মাঝে মাঝে খুব বৃষ্টি হতো । বিবেকদের টিনের চালে বৃষ্টি পড়া শুনতাম । তখন শীত শীত করতো । গায়ে চাদর জড়িয়ে আড়মোড়ে বসে থাকতাম যতক্ষণ না বৃষ্টি থেমে আসে ।

- নায়লা ।

- হ্যাঁ বল ।

- তোমার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে ?

নায়লা হেসে দিয়ে বললো, সে রকম কেউ নেই, তবে হতে কতক্ষণ ?

- সে তো বটেই ।

তারপর বললাম, অনুমতি দাও তো ফিরে যাই । রাত অনেক হলো ।

- আচ্ছা এসো । তোমার সাথে কথা বলে ভাল লাগলো । তোমার মধ্যে একটা ছন্নছাড়া ভাব আছে । তোমাকে বিশ্বাস করা যায় সাইদ ।

- সত্যি বলছো ?

- তোমাকে বিশ্বেস না করলে এতোটা পথ, এই রাত-বিরেতে হেটে এলাম ?

আমি বললাম,

এই যে বিশ্বেস করলে, দেখবে এর একটা ফল পাবে । আমাদের বিশ্বাস কম বলে অনেক কাজ আমাদের আয়ত্বে থাকলেও আমরা আগাই না । ভাবি কাজটা হবে না অথচ চেষ্টা করলেই কিন্তু হতো ।

নায়লা বললো, তোমার টেলিফোন নাম্বার রইলো । আজ কাল ফোন দেব ।

- ঠিক আছে । আমি তোমার ফোনের প্রতিক্ষায় থাকব । খুদা হাফেজ ।

নায়লা মাথা নেড়ে বিদায় জানাল ।

হাঁটা দিলাম জালান আমপানগের রাস্তা দিয়ে সোজা মেলা বরাবর । রাত বাড়ার সাথে সাথে রাস্তায় পথচারি কমে এসেছে । গাড়ীর সংখ্যাও কমে গেছে অনেক । আমি প্রায় একাই হাঁটছি । আমার ডান ঘেঁষে চলে যাচ্ছে দুই একটা মটর গাড়ি । সবাই ঘরে ফিরছে । নায়লাও নিঃশ্চয় এতক্ষণ ঘরে ফিরে সব গোছগাছ করে খেতে বসেছে বাবা-মার সাথে ।

পন্চম অধ্যায়

নায়লার চিঠি

দেশে এসেছি আজ কদিন হোল । ঝাড়া তিন মাস ছুটি । অনেক গুলো ভাগ্নি আছে দেশে, স্কুল-কলেজে পড়ে । ওদের নিয়ে গল্প করি আর গরম ভাত, গরম রুটি খেয়ে সময় কাটাই । বর্ষাকাল শুরু হয়েছে বাংলাদেশে । রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে, খেকশিয়ালের বিয়ে হচ্ছে । ছেলেবেলার ছড়াগুলো এসে বার বার নাড়া দিয়ে যায় মনে । এরি ফাঁকে গ্রামের বাড়ি ঘুরে এসেছি ।

দেশে এসে দেখি সবাই বাংলাদেশ নিয়ে খুব হতাশ । বাংলাদেশ যে কখনো উন্নতি করবে, এ যেন ভাবতেই পারে না অনেকে । আমার কিন্তু তেমনটি মনে হয় না । বড় কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে, কোন পরাশক্তির অশুভ নজরে না পড়লে, বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক ।

অনেকে বলে থাকেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়শিয়া কেমন এগিয়ে গেল অথচ আমরা এতো কাছের দেশ, কেমন পিছিয়ে রইলাম । কথাটা অনেক খানি সত্য, পুরোটা নয় । মালয়শিয়া স্বাধীন হয়েছে আজ থেকে প্রায় পন্চাশ বছর আগে । তাই ওরা কিছুটা বেশী সময় পেয়েছে আমাদের চেয়ে । আমরা স্বাধীন হয়েছি ছত্রিশ বছর হলো । এই ছত্রিশ বছরে আমাদের খুব একটা এগুনোর কথা না তারপরেও বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে বিগত বছরগুলোতে । আজকে ইউরোপে যে সভ্যতা দেখি, তা করতে ওদের কয়েকশত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে ।

সত্যি কথা কি, দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপীও দেশগুলো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় । এর আগে ওরা হামেশাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো । জার্মানী আর ফরাসিরা নিজেদের মধ্যে একাধিক বার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে । দ্বীতিয় বিশ্ব-যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম দেখে ওরা এক হয়ে ভাবতে থাকে কিভাবে যুদ্ধ বন্ধ করা যায় ফলে গড়ে উঠে ইউরোপিও ইউনিয়ন । ইউরোপে এখন যুদ্ধ বাধবে, তা ভাবাই যায় না । ফ্রান্স আর জার্মানী, চিরশত্রু দুই-দেশ আজকে পরস্পরের অতি বিশ্বস্থ বন্ধু ।

দেখতে দেখতে এক মাস পার হয়ে গেল । কখন যে হাতের ফাঁক গলিয়ে মাস চলে গেছে, খেয়াল করিনি । মনে হলো এই তো সেদিন এলাম দেশে । একদিন বিকেলে বসে চা খাচ্ছি । আমার ভাগ্নি তানিয়া একটি চিঠি ধরিয়ে দিল । দেখলাম মালয়শিয়া থেকে এসেছে । চিঠি খুলেই দেখলাম নায়লার চিঠি ।

সাইদ

আশা করি বাংলাদেশে ঠিক ঠিক পৌঁছে গেছ । এখন বর্ষাকাল শুরু হয়েছে বাংলাদেশে । তোমার যে সখ ছিল বর্ষা দেখবার, তা পূরণ হয়েছে । মানুষ যে ঝড়-বৃষ্টি এতো পছন্দ করে, তোমাকে না দেখলে জানা হত না ।

তোমার ভাই-বোনেরা নিশ্চয় তোমাকে পেয়ে অনেক খুশি ? আমার শুভেচ্ছা পৌঁছে দিও ।

আমার শিক্ষকতা চলছে যথারীতি । মাঝে মাঝে দুই একটা স্কেচ করবার চেষ্টা করি কিন্তু মন দিতে পারছি না স্কেচে । এমন কেন হলো ? তুমি থাকলে একটা সাজেশন দিতে পারতে ।

জালান আমপানগের রাস্তা দিয়ে হাঁটবার কথা মনে পড়ে ? মাঝে মাঝে সে পথে হেঁটে যাই । মনে পড়ে তোমার কথা । তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসো । কোন এক পূর্ণিমা দেখে আবারও হাঁটবো । কতটুকুই বা পথ ? তুমি চাইলে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে পার ।

হাসানের মাজারে নিশ্চয় গিয়েছ এরি মধ্যে ? করিম সাহেবের সাথে দেখা করে গাছের যত্ন নিতে বোলো । তুমি খুব, খুব ভাল থাক ।

ইতি নায়লা ।

চিঠিটা বার বার পড়লাম । এতো বার পড়লাম যে শেষের দিকে মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল । কোন লাইন পড়বার আগেই বলে দিতে পারছিলাম এর পরের লাইনে কি আছে । দেরি না করে উত্তর দিতে বসে গেলাম ।

নায়লা,

তোমার চিঠি পেলাম । শুনে ভাল লাগলো জালান আমপানগের রাস্তা দিয়ে হাঁটবার কথা তোমার মনে পড়ে । জালান আমপানগের ফুটপাথটা খুব চওড়া তাই হাঁটতে বেগ পেতে হয়নি সে রাতে । শুনে খুশি হলাম তুমি আবারো হাঁটতে চেয়েছ । মালয়শিয়ায় ফিরে আবারো হাঁটবো ।

নায়লা, খুব শখ হয়েছে জীবনের বাকি দিনগুলো তোমাকে আশ্রয় করে, তোমার উপর ভর করে কাটিয়ে দেয়া । তুমি কি বল ? ভেব দেখ আমার প্রস্তাবটা ।

তুমি ভাল থেক । ইতি সাইদ

ঝাড়া বিশ দিন পার হয়ে গেল তারপর একদিন সকালে নায়লার উত্তর এসে হাজির ।

নায়লা লিখেছে, তোমার প্রস্তাব আর শখটা নিয়ে বাবা-মার সাথে কথা বলতে দেরি হয়ে গেল । তোমাদের দেশের কবির মতন করে জবাব দিচ্ছি, আমি তোমারও সংগে বেঁধেছি আমারও প্রাণ, সুরেরও বাঁধনে ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সকালের নায়লা

রিং টনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল । ফোন তুলতেই নায়লার গলা ।

- আজ সারাদিন কি করছ ?

- খাতা দেখতে হবে । একগাদা খাতা জমে আছে । কাল না পারি পরশুর মধ্যে জমা দিতে হবে ।

নায়লা বলল,

এখন একবার আসতে পারবে ? তোমাকে কিছু ছবি দেখাতাম । অনেক কাঠ-খোড় পুড়িয়ে যোগাড় করেছি ।

- কিসের ছবি যোগাড় করলে ?

- আসলেই দেখতে পাবে ।

নায়লার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারা গেল না । বললাম, আসছি ।

নায়লাদের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দেড়টা । দাড়ওয়ান লম্বা সালাম দিয়ে হলুদ দরজাটা মেলে ধরলো ।

- আপা ভেতরে আছেন, আপনি সোজা চলে যান ।

বসার ঘরে দেখলাম নায়লা বসে আছে । ওর সামনে এক গাদা ছবি । সবগুলিই বাংলাদেশের ।

- এই দেখো, বলে ছবিগুলো মেলে ধরলো নায়লা ।

- কই থেকে পেলে ?

- আমাদের কলেজে বাংলাদেশ থেকে এক মেয়ে এসেছে । ওর কাছ থেকে নিয়েছি । মেয়েটা দারুণ আঁকে ।

- তাই নাকি ? এই বলে আমি সোফায় বসে পড়লাম ।

নায়লা বলল,

বাংলাদেশে যে এত গাছ-গাছালি আর বন-বাদারি আছে, অনেকে তা জানে না । অনেকে ভাবে বাংলাদেশ বুঝি শুধুই বন্যা আর রৌদ্রুর দেশ ।

আমি বললাম,

অনেকের কথা পুরোটা ভুল নয় । যখন গন গন শব্দে সূর্য উঠে, তখন শুধুই রৌদ্রু । আবার বর্ষাকালে খাল বিল ভরে যায় । এর পাশাপাশি রয়েছে বিস্তীর্ণ সবুজের মাঠ । ধান কাটার মৌসুমে পাকা ধানের গন্ধে ভরে যায় চারিপাশ । ধান কাটার আনন্দে কৃষাণ-কৃষাণীরা নাওয়া খাওয়া ভুলে যায় ।

- আমাকে নিয়ে যাবে সেই ধান ক্ষেতে ? নায়লা অধীর অগ্রহে জানতে চাইল ।

- তুমি তো দেখেছ এসব ।.

- তোমার মতন করে দেখিনি তাই তোমার সাথে থেকে দেখতে চাচ্ছি ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

কেউ একজন এসে খবর দিল, লান্চ রেডি । আপনারা আসুন ।

খাবার টেবিলে নায়লা একটা ছবি মেলে ধরলো । এক গ্রাম্য-গৃহিনী ধান খেতের সামনে দাঁড়িয়ে । ওর কোল জুড়ে ফুটফুটে শিশু । মা আর শিশু মিলে হাসছে অঝোরে ।

নায়লা বলল, এই ছবিটা আমি আঁকবো ।

- বেশ তো ।

- কিন্তু একটা শর্ত আছে ।

- বল ।

- আমি যখন আঁকবো, তখন তোমাকে ঐ সোফায় বসে থাকতে হবে ।

আমি জোরে হেসে বললাম, আমার থাকবার দরকার কি ?

- দরকার আছে, আলবত দরকার আছে । সে তুমি বুঝবে না ।

আমি আর কথা বাড়ালাম না । চুপ হয়ে গেলাম ।

টেবিলে নানা প্রকার খাবার দেয়া হয়েছে । বেশির ভাগ ইরানি কায়দায় বানানো । প্রতিটি খাবার এত সুস্বাদু আর পরিপক্কতায় ভরা যে টেবিল ছেড়ে উঠতে পারছিলাম না । তার উপর নায়লার জোরাজুরিতে আরো বেশি খাওয়া হলো ।

- তুমি এত কম খাও বলে তুমি এতো রোগা, নায়লা রাগ করে বললো কথাটা ।

রাগের কারণে নায়লার গোলাপি চিবুকে ছোট্র রেখা পড়লো । আমি তাকিয়ে দেখলাম, গোলাপি আকাশে রামধনু তার পাখা মেলে দিয়েছে ।

- আমার একটা অনুরোধ আছে সাইদ, রাখবে ?

- নিশ্চয় রাখবো ।

- আমরা যে বাড়িতে থাকব, সে বাড়ির দেয়াল চুন দিয়ে সাদা করে রাখবো । আমাদের ঘরটা বাঁশ আর বেত দিয়ে সাজাবো । তুমি কি বল ?

- ঠিক আছে । তোমার ইচ্ছে মতন সাজিও ।

নায়লা বলতে লাগলো,

বড় বড় বেতের চেয়ার এনে ঘরের চারিদিকে সাজিয়ে দেব । মাঝখানে থাকবে সেগুন কাঠের টেবিল । ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেব বাবুই পাখির বাসা ।

আমি বললাম, বুনো ঘরে থাকব, ভাবতেই দারুণ লাগছে । কবে বানাচ্ছো বাবুই পাখির বাসা ?

- অচিরেই ।

- খুদা তোমার ইচ্ছে পূরণ করুক নায়লা ।

নায়লা বললো,

কিছুদিন পর বাবা বদলি হয়ে ইরাক যাচ্ছেন । আমরাও যাচ্ছি বাবার সাথে । এক বছরের মাথায় বাবা অবসরে চলে যাবেন তারপর আমরা সবাই চলে যাব তোমাদের দেশে ।

- তাহলে আমাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে নায়লা ?

নায়লা বোধহয় একটু লজ্জা পেল । বললো, প্রথমে বাবা বাংলাদেশে ছোট্র একটা বাড়ি বানাবেন তারপর আমাদের বিয়ে হবে বাংলেদেশে ।

- সত্যি বলছ ? আমাদের বিয়ে তাহলে বাংলাদেশে হচ্ছে ? এ যে দারুণ ব্যাপার ।

- বাংলাদেশে হচ্ছে কারণ সে দেশে আমাদের ভাই হাসান শুয়ে আছে ।

- হাসান কে তুমি চাইলেও পাচ্ছ না নায়লা ?

- হু । তারপরেও বাংলাদেশে আমাদের বিয়ে হবে । সত্যি কথা কি জান, মানুষ কখনো মরে যায় না । এক জগত থেকে অন্য জগতে প্রবেশ করে মাত্র । তোমার যদি চোখ থাকতো, তুমি দেখতে হাসানের কবরের হাল । যেমন ধর, কেউ যদি নবীজির মাজারে গিয়ে সালাম দেয়, তিনি তার জবাব দেন । আমাদের কান নেই বলে শুনতে পাই না ।

আমি বললাম, কথায় কথায় তুমি নবীজির কথা বল । নবীজির জন্য তোমার দরদ অন্য রকম নায়লা ।

নায়লা অল্প হাসলো । কিছু বললো না ।

আমি বললাম, নজরুল ইসলামের একটা গান আছে নবীজিকে নিয়ে । শুনবে ?

- বেশ শুনাও ।

- আমার মোহাম্মদের নামের ধ্যান হৃদয়ে যার রয় । খুদার সাথে রয়েছে তার গোপন পরিচয় ।

নায়লা বললো,

খুদার সাথে নবীজির যে গোপন সম্পর্ক আছে, সে কথা অনেকেই জানে না । সৃষ্টি তত্বের কথাই বলো অথবা খুদা তত্বের কথাই বলো, এর অনেক কিছু নবীজির জানা ছিল কিন্তু তিনি তা সজ্ঞানে গোপন করে গেছেন । নায়লা একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো,

খুদাকে পাবার সবচেয়ে সহজ রাস্তা কি জান ? তা হলো প্রেম । একমাত্র প্রেমের মাধ্যমে খুদাকে পাওয়া যাবে । এই বিশ্বব্রম্মান্ডের যা কিছু চোখে পড়বে, তার শিকরে আছে প্রেম । খুদা তার প্রেমের ভান্ডার উজার করবার জন্য এই জগত তৈরি করেন ।

আমি বললাম, তুমি এত কিছু জানলে কি করে ?

- তুমি তো জান আমি ধর্ম তত্ত্বের ছাত্রী ছিলাম, এর পাশাপাশি দাদাজির কাছে শুনেছি ছেলেবেলায় ।

- আমার মনে হয় তুমি কোন পীর-ফকিরের শিষ্য ছিলে কারণ তোমার দেশ তো পীর-ফকিরে ঠাসা ।

নায়লা বলতে শুরু করলো,

আমার গুরু হলেন আমার দাদাজি যিনি খুদা তত্বের প্রথম ছবক আমাকে দিয়েছিলেন তারপর নিজ থেকে চর্চা করি ।

- তোমার দাদাজি কি আজো বেঁচে আছেন ?

- না । বছর খানেক হলো ইন্তেকাল করেছেন । তার মাজার নিশাপুরে । তুমি যদি কখনো নিশাপুর যাও দেখবে কেমন সূফীদের মেলা । কেউ যদি দাদাজির মুরিদ হতে চাইতেন, তিনি তিনটে শর্ত জুড়ে দিতেন । প্রথমত, কেউ তাকে কোন উপহার সাধতে পারবে না অথবা উপহার এলে উপস্থিত সকলের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে । দ্বীতিয়ত, তার মুরিদকে অবশ্যই ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে

হবে । অভাবগ্রস্ত হলে ঘরে পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে । তৃতীয়ত, কেউ দাদাজিকে মাথা নুয়ে সম্মান দিতে পারবে না । দাদাজি যে আসনে বসবেন বা নামাজ পড়বেন, সবাইকে সে আসন ব্যবহার করতে হবে । দাদাজি আরো একটা কাজ করতেন আর তা হলো, তার কোন মুরিদ খারাপ কাজ করলে তিনি তার হয়ে তওবা করতেন । দাদাজি বলতেন, তার পাপের জন্য তার মুরিদ খারাপ কাজটি করেছে, অতঃপর সেই পাপ মোচনের জন্য তিনি গভীর ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন ।

আমি বললাম, তোমার দাদাজির আখলাক নবীজিকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।

নায়লা বলল,

আমার দাদাজি নিজেকে খুব ক্ষুদ্র ভাবতেন । যেমন, আমাদের নবীজি দিনে সত্তুর বার নিজের গুনাহর জন্য ক্ষমা চাইত অথচ দেখ তার হাতেই আছে সাফায়াতের চাবি আর হাউজে কাউছারের কতৃত্ব । দাদাজি পড়াশুনা খুব ভালবাসতেন । নিজের ছেলে-মেয়েদের যেমন স্কুলে পাঠাতেন, তেমনি মুরিদদের জোর তাগিদ দিতেন । তিনি একাধারে আরবি ও ফার্সির বিশেষজ্ঞ ছিলেন । জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সাহিত্য চর্চ্চায় তার মতন উৎসাহি লোক ইরানে খুব কম পাবে । নূতন কোন লোক দাদাজির আস্তানায় এলে তার পক্ষে দাদাজিকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হতো কারণ তিনি মুরিদদের ভেতরে গিয়ে বসতেন । দাদাজির জন্য আলাদা কোন আসন নির্ধারিত ছিল না ফলে কে মুরিদ আর কে গুরু, সেইটে বোঝা খুব শক্ত হতো ।

আমি বললাম, যদি কিছু মনে না কর তো জানতে চাইছি, উনি কি কাজ করতেন ?

- দিনের বেলায় স্কুলের শিক্ষকতা করতেন তারপর সন্ধ্যে নামলে মুরিদদের নিয়ে বসতো তারপর শুরু হতো ইশকের গান আর আহাজারি । জীবনের ত্রিশটা বছর কেটেছে তার শিক্ষকতা করে । সেই উপার্জনে আমার বাবা, চাচা আর ফুপিরা লেখাপড়া করেছে ।

আমি বললাম, তাই বুঝি তোমাদের এত লেখাপড়া হয়েছে ?

- প্রথম জীবনে বাবা একদম পড়তে চাইতো না । দাদাজি জোর করে স্কুলে পাঠাতো ।

- তুমি কখনো গিয়েছ দাদাজির আস্তানায় ?

নায়লা হেসে বললো, আস্তানার সাথেই তো আমাদের বাড়ি ছিল । বাড়ির জানালা দিয়ে সব দেখতাম ।

- তোমার দাদাজির ইন্তেকালের পর তোমার বাবা কি সেই হাল ধরেছেন ?

নায়লা বলল,

সবাইকে দিয়ে খুদা সব কাজ করাবেন না । বাবার চেয়ে ঢের ঢের যোগ্য লোক ছিলা দাদাজরি আস্তানায় । ওরাই দাদাজির হাল ধরেছে । সন্তান হলেই যে সব যোগ্যতা আছে, তা ভাববার কারণ নেই ।

- দাদাজির দুই একটা শিক্ষার কথা বলবে নায়লা ?

- দাদাজি মূলত আল্লাহ-রাসুলের প্রেম শিক্ষা দিতেন । প্রেমের পথই মুক্তির পথ । প্রেমের পথে খুদা-রাসুলেকে পাওয়া শক্ত নয় । নবীজিকে তার সাথীরা কেমন ভালবাসতো, তার একটা কাহিনী শুনবে ?

- বল শুনি ।

- তুমি ওয়াইস কারনির কথা জান ?

আমি মাথা নেড়ে না বললাম ।

নায়লা বলল,

সেইটে ছিল নবীজির যামানা । ওয়াইস কারনি নামে এক বুযুর্গ ব্যক্তি ইয়েমিন দেশে বাস করতেন । ওয়াইস কারনি কখনো নবীজির সাথে দেখা করতে আসেননি কারণ তার ছিল বৃদ্ধা মা । বৃদ্ধা মা কে ফেলে তার আসা সম্ভব হয়নি । একবার এক যুদ্ধে নবীজির কিছু দাঁত ভেঙে যায় । সেই খবর ওয়াইছ কারনির কানে গেলে তিনি পাথর দিয়ে তার সামনের দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেললেন । তখন তার মনে হলো, নবিজীর হয়ত পিছনের দাঁত খোয়া গেছে । এ ভেবে তিনি পিছনের দাঁতগুলো গুড়িয়ে দিলেন । তখন তার মনে হলো নবীজির হয়তো ডান দিকের দাঁত খোয়া গেছে । তখন তিনি ডানের দাঁত উপরে ফেললেন । এভাবে একে-একে সব দাঁত গুড়িয়ে দেন ওয়াইছ কারনি ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । বসে বসে ওয়াইছ কারনির কথা ভাবতে লাগলাম । কিছুক্ষণ পরে বললাম,

আমাদের পাক ভারতে রামকৃষ্ণ নামে এক সাধক ছিলেন । তিনি সকল ধর্মের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন তবে হিন্দু দেবি মা-কালির প্রতি তার বিশেষ ভক্তি ছিল । তুমি কি রামকৃষ্ণের কথা শুনেছ ?

নায়লা মাথা নেড়ে জানাল, সে শুনেছে ।

আমি বললাম,

মা কালিকে পুজো দিতে দিতে রামকৃষ্ণের এমন অবস্থা হলো যে তিনি ভারতবর্ষের সব নারীদের মধ্যে মা-কালির ছায়া দেখতে শুরু করেন । ফলে যা হবার তাই হলো । তিনি তার স্ত্রী সারদা

দেবির মধ্যেও সেই ছায়া দেখতে পান । পরবর্তিতে নিজের সহধর্মনীকে পূজো দিতে শুরু করেন । রামকৃষ্ণ ভারতবর্ষে পরমহংসদেব বলে পরিচিত ।

- এই পরমহংসদেব টা কি সাইদ ?

আমি বললাম,

তুমি যদি পানির সাথে দুধ মিশিয়ে কোন হাসকে খেতে দাও, দেখবে হাস পানিটুকু সরিয়ে দুধ টুকু খেয়ে ফেলেছে । ঠিক তেমনি রামকৃষ্ণ সংসারের দুধটুকু তুলে নিয়ে অচ্ছিষ্টকে ফেলে দিতে পেরেছিলেন তাই তাকে পরমহংসদেব বলা হয় । কিন্তু মজার ব্যাপার কি জান, এই জগত বিখ্যাত মানুষটির শেষকৃত্যে মাত্র গুটিকয়েক লোক হাজির ছিল ।

নায়লা বললো, তাহলে রামকৃষ্ণ এত বিখ্যাত হলেন কি করে ?

- রামকৃষ্ণের কথা জগত কখনো জানতো না যদি না বিবেকানন্দ তার শিষ্য না হতেন । রামকৃষ্ণ লোকান্তারিত হবার পর বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের দর্শন প্রচার শুরু করে যা রামকৃষ্ণকে রাতারাতি বিখ্যাত করে ফেলে ।

নায়লা বলল, শিকাগো ধর্মসভায় বিবেকানন্দ যে স্পীচটা দিয়েছিল, সেইটে আমাদের ধর্মতত্ব ক্লাসে পড়ানো হতো ।

আমি বললাম,

বিবেকান্দের মতন এতো বিদ্বান আর এতো ভাল ইংরেজী জানা মানুষ ভারতবর্ষে কমই জন্মেছে । তবে রবীন্দ্রনাথও খুব ভাল ইংরেজী জানতেন । গীতান্জলি কাব্যগ্রন্থ নিজের হাতে অনুবাদ করে তিনি নবেল জিতে নেন । তুমি যে বললে সত্য জানা এক জিনিষ আর ভেলকি দেখানো আরেক জিনিষ । তোমার কথাটা মনে হয় ঠিক ।

- কিভাবে বুঝলে ?

আমি বললাম, একদিন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে গিয়ে বলল, আমার ভেতরে যে ক্ষমতা আছে, তা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি ।

তখন বিবেকানন্দ বললো, তোমার এই ক্ষমতা পেলে আমি নিজেকে চিনতে পারব ?

- না তা পারবে না, রামকৃষ্ণের সাফ জবাব ।

- সেক্ষেত্রে এই ক্ষমতার আমার দরকার নেই । আমি চাই না ।

বিবেকানন্দের উত্তর শুনে রামকৃষ্ণ খুশি হল । তিনি বুঝতে পারলেন, তার শিষ্য মানুষকে ভেলকি দেখনোর জন্য তার কাছে আসেনি । সে এসেছে সত্যকে জানতে । আসলে বিবেকানন্দকে পরীক্ষার জন্য রামকৃষ্ণ এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন ।

নায়লা বলল, তাহলে এবার তোমাকে পরীক্ষা করি । দেখি তুমি আমাকে কতটুকু ভালবাস ?

আমি দাঁড়িয়ে বললাম,

তোমাকে ভালবাসি সে নিয়ে সংশয় নেই । হয়ত সাগর তার জল মহাশুন্যে ঢেলে দেবে । পৃথিবীর সাথে অভিমান করে সূর্য হয়ত আর উদয় হবে না কিন্তু আমার ভালবাসা তোমার জন্য থাকবে । জন্ম থেকে জন্মান্তরে, মর্ত্ত থেকে স্বর্গ লোক পর্যন্ত বিস্তৃত হবে ।

তাকিয়ে দেখলাম নায়লা তাকিয়ে আছে আমার দিকে অপলক নয়নে । ধীরে ধীরে অশ্রু ছড়িয়ে পড়ছে ওর চোখে-মুখে । সেই সিক্ত অশ্রু হাজারো মণিমুক্ত হয়ে সারাটা ঘর আলোয় আলোয় ভরে ফেললো ।

নায়লা বলল, ঐ দূর পাহাড়ের চূড়ায় এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে ।

- তোমার কথাই রইল । আমি উঠবো । ওই পাহাড় বেয়ে উঠবো । তুমি এখান থেকে বসে দেখো ।

নায়লা কিছু বললো না । চুপ হয়ে গেল ।

আমি বললাম, তোমার দাদাজি কি গান গাইতে জানতেন ?

- উনার গলায় সমস্যা ছিল তাই গান গাওয়া হয়নি তার তবে নিমিষেই বড় বড় গান বাঁধতে জানতেন । দাদাজী যে গান গাইতে পারতেন না, সেজন্য ওর আফসোস ছিল । দাদাজির আস্তানায় গেলে দেখতে কেমন বড় বড় গাইয়ে ছিল । ওরা হামেশাই ইশকের গান গাইতো আর আহাজারি করত । কত মানুষ যে দাদাজির আস্তানায় এসে পরিবর্তন হয়ে গেছে, তার হিসেব নেই ।

আমি বললাম,

পাক-ভারত মহাদেশে আমাদের পুর্বপুরুষেরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তার মূলে ছিলেন সূফীরা । সূফীরা তাদের আধ্যাত্বিক প্রভাব খাটিয়ে মানুষের দিলকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসে । সূফীদের আধ্যাত্বিক প্রভাব এত বেশি ছিল যে, ভারতবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে । বাংলাদেশে যে সব বড় বড় সূফীদের কথা জানা যায়, তাদের একটা বড় অংশ তোমাদের ওদিক থেকে এসেছিল । সিলেটের শাহজালাল সম্ভবত ইয়েমেন থেকে এসেছিলেন ।

নায়লা বললো,

শুধু ভারত বর্ষে না । সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আরবীয় বণিক আর সূফীরা ইসলাম প্রচার করেছিল । তুমি কি রুমির লেখা মছনবী পড়েছ ?

বিনয়ের সাথে বললাম, শুনেছি, পড়া হয়নি কখনও । রুমির মছনবী নিয়ে কিছু বলবে ?

নায়লা বলতে শুরু করল,

মাওলানা রুমির জন্ম হয়েছিল তৎকালিন খোরসান অন্চলে । তিনি অতিশয় পন্ডিত-মানুষ ছিলেন । কোরান, হাদিস আর ফেকাহ শাস্ত্রে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না । দূর-দূরান্তের মানুষেরা ওর কাছে আসত জ্ঞান শিক্ষা করতে । আমির-বাদশাহদের যাতায়াত ছিল রুমির দরবারে । একবার রুমি পানি ভর্তি একটা গামলার পাশে বসে ছিলেন । তার সামনে অনেক দুষ্প্রাপ্য কিতাব সাজানো ছিল । তখন সামসতিবরিজ সেখানে হাজির হন । এই সামসতিবরিজের কথা কি তুমি জান, সাইদ ?

- মনে হয় না ।

নায়লা বলতে শুরু করল,

সামসতিবরিজ হলো শহরের এক বুযুর্গ ব্যক্তি, যিনি প্রকাশ্যে পাশা খেলতেন যেন শহরবাসী তার বুযুর্গি না ধরতে পারে । তিনি লোক চক্ষুর মধ্যে থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন । আগের ঘটনায় ফিরে যাই । রুমি যখন গামলার পাশে বসে ছিলেন, তখন সামসতিবরিজ সেখানে হাজির হয় । তিনি রুমিকে জিজ্ঞেস করেন, হে রুমি, তোমার সামনে এসব কিসের কিতাব ?

রুমি অহংকারের সাথে বললো, এসব এমন কিতাব যা তুমি বুঝবে না ।

সামসতিবরিজ তখন কিতাবগুলো গামলার পানিতে ফেলে দেয় । সামসতিবরিজের কান্ড দেখে রুমি তো অবাক ।

-তুমি জান, এ কিতাবগুলো কত মূল্যবান ? তুমি পানিতে ফেলে দিলে ?

সামসতিবরিজ আর দেরি না করে কিতাবগুলো পানি থেকে তুলে আনলো । মজার ব্যাপার কি জান, সেই কিতাবের একটি পাতাও ভিজেনি । এ-দৃশ্য দেখে রুমি তো অবাক ।

রুমি বললো, এ কি করে হলো ?

সামসতিবরিজ বললো,

এ এমন এক ব্যাপার, যা তুমি বুঝবে না, এই বলে সামসতিবরিজ রুমিকে আলিঙ্গন করলেন । এই আলিঙ্গনের সাথে সাথে রুমির অন্তরের দ্বার খুলে গেল । তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি

যতই পন্ডিত হোক না কেনো, লোকচক্ষুর আড়ালে এমন ব্যাপার আছে, যা তার জানা নেই । সামতিবরিজের কাছে তার খবর পাওয়া যাবে । জ্ঞান পিপাসু রুমি আর দেরি করলো না । সামসতিবরিজের পিছু নিলো, এই বলে নায়লা চুপ হয়ে গেল ।

আমি বললাম, কি থামলে যে ? তারপর কি হলো ?

নায়লা বলল, সেই কখন থেকে তুমি বসে আছ । তোমার নিশ্চয় গলা শুকিয়ে গেছে এরি মধ্যে । আমি এক গ্লাস সর্বত করে দিচ্ছি ।

- আমি ভাল অছি । তুমি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছ । এবার রুমির গল্পটা শেষ কর ।

নায়লা হেসে বললো, অনুমতি দাও । বাঁধা দিও না । তোমাকে সর্বত খাওয়াতে আমার প্রাণ ছিড়ে যাচ্ছে ।

- ঠিক আছে । নিয়ে আস ।

পনেরও মিনিটের মধ্যে নায়লা ফিরে এলো । কি সুন্দর ঝকঝক গ্লাসে ঠান্ডা সর্বত । আমি খেতে শুরু করতেই দেখি নায়লা তাকিয়ে আছে আমার দিকে ।

- কি দেখছো ?

- তোমাকে খাওয়াতে আমার সব আনন্দ । কবে আমি তোমাকে রান্না করে খাওয়াবো, সাইদ ?

- তুমি যেদিন চাইবে সেদিনই ।

- খুদা কি আমাকে সে ভাগ্য দেবেন ? আমার কেন জানি মনে হয় তুমি হারিয়ে যাবে ।

- তা কেন হবে ? তোমার এ কথা মনে হচ্ছে কেন ?

নায়লা বলল, হাসানকে হারাবার পর থেকে সব সময় মনে হয় এই বুঝি কেউ হারিয়ে গেল ।

আমি বললাম, নিশ্চয় খুদা আমাদের সহায় হবেন । তুমি কিছু ভেব না ।

নায়লা কিছু বললো না । চুপ হয়ে গেল ।

আমি বললাম, এবার রুমির গল্পটা শেষ কর ।

নায়লা বলতে শুরু করল,

রুমি সামতিবরিজের সাথে এমন ভাবে থাকতে শুরু করলেন যেমন আমাদের ছায়া আমাদের সাথে ঘুরে বেরায় । শহরের সবাই অবাক হয়ে দেখলো, রুমির মতন একজন অসাধারণ মানুষ নাওয়া-খাওয়া ভুলে এক পাগলের পেছনে ঘুরে বেড়ায় । রুমির দরবার আর আগের মতন নেই, নেই কোন

শান শওকত, না লোক সমাগম । এভাবে রুমি খুদা-তত্বের অনেক জ্ঞান লাভ করলেন সামসতিবরিজের কাছে তারপর সেই লব্দ-জ্ঞান থেকে রচনা করলেন বিখ্যাত গ্রন্থ মছনবী শরীফ ।

আমি কিছু বললাম না । বসে বসে মাছনবীর কথা ভাবতে লাগলাম ।

নায়লা বলে উঠলো, কি ভাবছো ?

আমি বললাম, তুমি যে খুদা-তত্বের কথা বললে, সেইটে একটু খুলে বলবে ?

নায়লা বলতে লাগলো,

খুদা তত্বের জ্ঞান হলো খুদার সত্বা আর বৈশিষ্ট নিয়ে জ্ঞান । আমরা জানি খুদা সর্বশক্তিমান কিন্তু সেইটের স্বরুপ কি তা জানা নেই । খুদা-তত্ববিদরা সেইটে বুঝেন অন্তর দিয়ে । হিন্দু আর খ্রীষ্টান সাধুরা যেমন ত্রিত্ববাদ ব্যাখা করতে পারে না, সূফীরাও খুদা তত্বের স্বরুপ ব্যাখা করতে অপরাগ হন । তুমি কি জান, খুদা মুছাকে পাঠিয়েছিল খিজিরের কাছে খুদা তত্ব শিখতে ?

- কোথায় যেন শুনেছিলাম সে কথা । ঠিক মনে আনতে পারছি না । তুমি একটু ধরিয়ে দিলে মনে পড়বে ।

নায়লা বলতে শুরু করল,

খুদা বললেন, হে মুসা, খিজিরের কাছে গিয়ে জ্ঞান অর্জন কর । আদেশ মাত্র মুসা খিজিরের কাছে গেলেন । খিজির মুসাকে খুদা-তত্ব শিক্ষা দিতে রাজি হলেন কতগুলো শর্তের বিনিময়ে । মজার ব্যাপার কি জান, মুসা শেষমেষ সেই শর্ত রক্ষা করতে পারলেন না, ফলে তাকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল ।

আমি বললাম, তোমার দাদাজির কাছে কি খুদা তত্বের খবর ছিল ?

- খুদা-তত্বের অনেক কিছুই দাদাজি জানতেন কিন্তু তা ঠিক কতটুকু, সেইটে বলতে পারছি না । দাদাজির সহচরদের মধ্যে অনেকেই খুদা-তত্বের খবর পেয়েছে ।

- এটা কি করে হলো ?

নায়লা বলল,

খুদার নজর সব সময় সূফীদের উপর নিবিষ্ট থাকে তাই সূফীদের সাহচর্যে যারা থাকেন, তাদের উপরও খুদার নজর পড়ে যায় । আর যখনই খুদার নজর পড়তে শুরু করলো, খুদা-তত্বের ব্যাপারগুলো প্রকাশিত হতে থাকে । খুদা-তত্বই বল আর সাহিত্যই বল, এসব শিখতে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন কারণ তিনি এই পথের পথিক । অনেক মূল্যবান তথ্য তার ভান্ডারে গচ্ছিত আছে, যা তোমার শেখার পথে কাজে দেবে ।

তখন বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে । বাইরে তাকিয়ে দেখলাম দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মেঘ জমতে শুরু করেছে । আমি বললাম, এবার উঠি । বৃষ্টি আসছে মনে হয় ।

- এতো কিছু ছাপিয়ে তোমার বৃষ্টি চোখে পড়লো ?

আমি বললাম,

আমি বাংলাদেশের ছেলে । ঝড়-বৃষ্টি আমাদের নিত্য সাথি । ছোটবেলায় যে কত বৃষ্টিতে ভিজেছি, সে ফিরিস্তি তোমাকে পরে দেব । যাই হোক, আমি উঠছি ।

- আরো কিছুক্ষণ বসে যাও । চলে গেলে তো গেলেই ।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

ঠিক আছে বসছি, আর উঠছি না, এই বলে সোফায় এলিয়ে বসলাম ।

- ভেবো না । দেরি হয়ে গেলে বাড়ীর গাড়ি তোমাকে পৌঁছে দেবে, এই বলে নায়লা বলতে শুরু করলো,

একবার দাদাজির আস্তানায় গিয়ে দেখি দাদাজির এক মুরিদ অঝোরে কাঁদছেন । আমি বললাম, আপনি কাঁদছেন যে ? তিনি বললেন, আপনার দাদাজির জন্য উপহার হিসাবে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এনেছিলাম । তিনি এর থেকে মাত্র একটি মুদ্রা নিয়ে বাকীটা ফিরিয়ে দিলেন অথচ এর পুরোটাই আমি হালাল পথে আয় করেছি । আমি বললাম, দাদাজি আপনাকে ঠিক কি বলেছেন ? লোকটি বলল, আপনার দাদাজি বললেন, তোমার উপহার আমি ফিরিয়ে দেব না, এই নিচ্ছি, এই বলে একটি মাত্র মুদ্রা তুলে নিলেন তারপর বললেন, বাকী মুদ্রাগুলো স্কুল পড়ুয়া এতিম ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে । এ রকম কেন হলো জান ? নায়লা মাথা ঝুঁকে জানতে চাইলো ।

আমি বললাম, তুমি বলো ।

- যিনি খুদাকে জানেন, যিনি খুদা তত্বের সাথে পরিচিত, তিনি অভাবশুন্য । না তার কোন স্বর্ণমুদ্রার দরকার আছে না কোন সাহায্য । খুদা ছাড়া কারো মুখাপেক্ষি নন তিনি ।

গল্প করতে করতে কখন যে সন্ধ্যে নেমেছে, সে খেয়াল আমাদের নেই । এরি ফাকে হালকা বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখন না উঠলেই না ।

উঠে পড়লাম । বললাম, এবার ছুটি দাও । আমি যাচ্ছি ।

নায়লা আর কথা বাড়াল না । শুধু বলল, ড্রাইভার সাহেব রেডি হয়ে আছে । তোমাকে পৌঁছে দেবে ।

গাড়িটা যখন নায়লাদের বাড়ি পেরিয়ে মেইন রোডে নামলো, তখন আবারও শুরু হল বৃষ্টি । রাস্তার দু-ধারে সবুজের পাহাড় আর জলাভূমি । এসব ফেলে আমরা ছুটে চলেছি উত্তরমুখী । বাইরে তাকিয়ে দেখলাম শ্বেত-শুভ্রত বৃষ্টির ফেনা ঘুরপাক খাচ্ছে গাড়ির চারিপাশে । কেমন যেন শীত শীত করতে লাগলো । কোটটা ভাল করে জড়িয়ে বসলাম ।

নায়লার কথা এসে মনে ভর করল । আমার মনে হতে লাগল, কে এই নায়লা ? হঠাৎ একদিন পরিচয় তারপর ভাল লাগা । এখন বিয়ের সব আয়োজন করে ফেলেছি । নায়লারা কিছুদিন পর ইরাকে চলে যাবে কারণ তার বাবার পোস্টিং হয়েছে । এরপর আমাদের বিয়ে হবে বাংলাদেশের মাটিতে কারণ সেখানে শুয়ে আছে নায়লার ভাই হাসান । আমি কি সত্যি সত্যি নায়লাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, না এ নিছক কল্পনা ? প্রতি মুহুর্তে যার অবয়ব বেয়ে অঝোরে ঝরে পড়ছে হাজারো নক্ষত্রের আলো, যার শিরায় শিরায় নিরন্তর বয়ে চলছে খুদা-রাসুলের ইশকের তরঙ্গ । সেই অচেনা, সেই অজানা, সেই অপ্সরীর স্বামী হবার সৌভাগ্য কি আমার হবে ? এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে বাড়ি পৌঁছে গেছি, খেয়াল নেই । তাকিয়ে দেখলাম গাড়িটা ধীরে ধীরে ঢুকছে আমার বাঙলোর আঙ্গিনায় ।

সপ্তম অধ্যায়

ইরাক থেকে

পোষ্ট বক্স খুলতেই নায়লার চিঠি । ইরাক থেকে এসেছে । বড় বড় হরফে লেখা । অল্পতেই পাতা ভরে উঠেছে ।

নায়লা লিখেছে, ইরাকে পৌঁছেছি আজ কদিন হলো । ঘর-বারান্দা গোছাতে গোছাতে এক সপ্তাহ । বাবা তার অফিস নিয়ে বসেছে । শহরের মাঝেই আমাদের বাসা । ইরাকে এখন গৃহযুদ্ধ চলছে । আমাদের সাবধানে চলাফেরা করতে হয় । অচিরেই বড় চিঠি দেব । তোমার উত্তরের প্রতিক্ষায় রইলাম ।

নায়লার চিঠি পেয়ে জবাব দিতে বসে গেলাম ।
তোমার চিঠি পেয়ে ভাল লাগল । শুনে খুশি হলাম তুমি সব গোছগাছ করে ফেলেছ এরি মধ্যে । তারপর কেমন আছ ? জালান আমপানগের রাস্তা দিয়ে হাঁটবার কথা মনে পড়ে ?

আজ মাস দুই হলো নায়লা মালয়শিয়া ছেড়েছে কিন্তু তাই বলে মালয়শিয়ার স্বাভাবিক জীবনের কোন ব্যাত্যয় ঘটেনি । ভোর হতেই লোকজন ছুটোছুটি শুরু করে । ছেলেপুলেরা লাইন ধরে স্কুল বাসের জন্য । আমার কাচের জানালা গলিয়ে সকালের রৌদ্রু এসে পড়ে । বাইরে তাকিয়ে দেখি সারাটা পাহাড় শিশিরে শিশিরে ছেয়ে আছে । পরিস্কার আকাশে যতদূর চোখে পড়ে শুধুই নীলিমা । সেই নীলিমা চিড়ে উড়ে চলে সাদা হাসের ঝাঁক । এখন আর নায়লার ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় না । নায়লার নক্ষত্র ঝড়া চাহনিতে আর চমকে উঠি না ।

ফোন টনের শব্দ হচ্ছে অনবরত । রিসিভার তুলতেই নায়লার বাবা । আমি সালাম দিয়ে বললাম, কেমন আছেন আংকেল ?

নায়লার বাবা বলল, হঠাৎ দূর্ঘটনা ঘটে গেল, এই বলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন ।

আমি বললাম, আপনি কি লাইনে আছেন ?

- নায়লাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । কিছুক্ষণ আগে এক লোক ফোন করে জানালো ওরা নায়লাকে ধরে নিয়ে গেছে । ওদের কাজ শেষ হলে ওকে ছেড়ে দেবে ।

আমি বললাম, এখন কি করবেন ?

- তুমি তো জান ইরাকের অবস্থা । চারিদিকে যুদ্ধ চলছে । কাকে কি বলব ? আমি চুপ হয়ে গেলাম । বুঝলাম বিপদ চলে এসেছে আমার জীবনে ।

নায়লার বাবা আবার বলতে শুরু করলেন,

কিছুক্ষণ আগে নায়লা ফোন করেছিলো । সে জানালো ওকে যারা কিডন্যাপ করেছে, ওরা খুব ভাল ব্যবহার করছে ওর সাথে । অনেক বিদেশীকে ধরে এনেছে ওরা । নায়লার কাজ হলো সেই বিদেশীদের সাথে কথা বলা আর ইংরেজীতে চিঠি পত্র লিখে দেয়া । এর বেশি নায়লা জানাতে পারিনি । সে তোমাকে চিঠি দেবে ।

www.sayedhossain.com

অষ্টম অধ্যায়

নায়লার চিঠি

সাইদ,

আমার অনেক ভালবাসা নাও । দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেলো । নূতন বছর এসেছে । আবারও জানুয়ারি মাস, হাসানের ইন্তেকাল বার্ষিকী । বাবা-মা নিশ্চয় হাসানের মাজারে বসে আছে এখন । আমি দূর থেকে হাসানের জন্য দোয়া করছি ।

তারপর বলো, কেমন আছো ? তোমাকে যখন শেষ দেখি, তখন তুমি খুব রোগা ছিলে । তুমি বরাবরি রোগা । কতবার বলেছি ঠিক মতন খাবে, রাত জেগে শরীর খারাপ করবে না । আমার কথা কখনো আমলে নাও নি তুমি ।

যারা আমাকে ধরে এনেছে, ওরা বরাবরি আমার সাথে ভাল ব্যবহার করছে । আমার কাজ হলো বিদেশী বন্দিদের সাথে কথা বলা আর ইংরেজীতে চিঠি- পত্র লিখে দেয়া । ওরা কথা দিয়েছে, ওদের কাজ ফুরুলে আমাকে ছেড়ে দেবে ।

সাইদ, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরো । আমি আসবো, নিশ্চয় ফিরে আসবো । আমি যে জন্মেছি শুধু মাত্র তোমারি জন্য । প্রতি বছর জানুয়ারিতে একটি চিঠি লেখার অনুমতি আমি পেয়েছি । আমার এই চিঠি সারা বছরের জন্য রেখো । বাবা-মাকে আমার চিঠির কথা বলো । ওদের বোলো আমি আবার ফিরে আসবো । অনেক অনেক ভাল থেকো ।

তোমার নায়লা

ISBN No. 978-983-43934-3-4

নবম অধ্যায়

অপেক্ষার পালা

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেলো । নূতন বছরকে বরণ করতে নূতন করে সেজেছে মালয়াশিয়া । মানুষেরা ঘর-দোর গুছিয়ে গ্রামের বাড়ি ফিরছে । কোথাও কোন সুর কেটে যায়নি, শুধু নায়লার চিঠি আজো এলো না । প্রতিদিন লেটার বক্স খুলে দেখি । পোস্ট অফিসে খোঁজ নিয়েছি । না, চিঠি নেই । নায়লার বাবা-মা নিশ্চয় এখন হাসানের মাজারে । যে কোন সময় ফোন করে জানতে চাইবে নায়লার কথা । কি উত্তর দেব সেইটে ঠিক করতে পারছি না ।

দেখতে দেখতে আরো দুটো বর্ষাকাল পার হলো । বর্ষাকাল আবারো এসেছে । জালান আমপানগের ফুট পাথ দিয়ে ঝড়-বাদল মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছি । তখন সবে মাত্র সন্ধ্যে নামতে শুরু করেছে । ডাইনে-বায়ে কোন পথচারি চোখে পড়লো না । এই প্রবল বর্ষণকে উপেক্ষা করে কেউ বেরুতে সাহস করেনি । রাস্তায় দুই একটা গাড়ি চোখে পড়ল । হেড লাইট জ্বালিয়ে এগুচ্ছে ওরা । নায়লার চিঠি আজো আসে নি । নায়লার বাবা মাকে জানানো হয়নি সে কথা । মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছি, নায়লা ভাল আছে । শীঘ্রই ফিরে আসবে, লিখেছে । উনারা আর কথা বাড়ান নি । শুধু বলেছেন, একবার আমাদের এ দিকে ঘুরে যেও । আমাদের দোয়া নাও ।

নায়লাকে কথা দিয়েছি তার জন্য অপেক্ষা করবো । সেই অপেক্ষার পালা শুরু হয়েছে । জানি না কবে ফিরবে নায়লা ।

শেষ

Please comment about the book at : sayed.hossain@yahoo.com
Please visit my webpage at: www.sayedhossain.com
Feb, 2010